ছেলেকে চূড়ান্ত শিক্ষা দিব।"—তিনি নিজের দারিদ্র্যকে কখনও ভয় করিতেন না। ভয়-ভাবনা কাহাকে বলে আমার পিতামহ জানিতেন না। নির্ভীক, বীর, তেজস্বী দরিদ্র গ্রাম্য পণ্ডিত। এমন পিতা মাতার সন্তান কখন কি নির্বীর্য্য, দুর্ব্বল, হীন হওয়া সম্ভব? পিতা মাতার নিকট হইতে তিনি হৃদয়-মনের বল ও বীর্য্য লাভ করিয়াছিলেন। বাবার মধ্যে যাহা প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছিল—তাঁর অধিকাংশ ভাবই তাঁর জনক-জননীর ভিতর ছিল। বাবা ছিলেন কবি, সুলেখক, সুরসিক; এ সকল শক্তি তিনি পিতৃমাতৃকুল হইতে লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা রসগ্রাহী কাব্যানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বাগ্মী বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন না বটে, কিন্তু অতিশয় সুরসিক এবং সদালাপী ছিলেন; তাঁর সেই প্রচ্ছন্ন শক্তি পুত্রের ভিতর এক মহাশক্তিরূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। আমার পিতা যে উচ্চ অঙ্গের কবি ছিলেন, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ব্বাচনানুসারে যদি বিচার করিতে হয়, তাহা হইলেও কাব্যজগতে আমার পিতার আসন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না;—কিন্তু তাঁর আসন যে হেমচন্দ্র বা নবীনচন্দ্রের অনেক উপরে, সে কথা বলিলে আবার পিতৃশ্লাঘী অপরাধে অপরাধিনী হইতে হইবে না। আমার পিতার কবিতা-সকল কয়জন পাঠ করিয়াছেন? যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা আমার কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন; যাহারা পাঠ করেন নাই, তাঁহারা অপরের মুখে ঝাল খাইয়া রসাস্বাদন করেন, তাঁহাদের মন্তব্যের কোন মূল্য নাই। যে সৌন্দর্য্য এবং সদাচার সৃষ্টি করিতে পারে সেই সুকবি। আমার পিতার কবিতায় যেমন উদ্দীপনা, তেমনি সৌন্দর্য্য, তেমনি সদ্ভাব। যাহা আর বঙ্গদেশের দ্বিতীয় কবির ভিতর দেখা কঠিন, তাহা, বাবার জীবন এবং কবিতার অক্ষরে অক্ষরে মিল। কবিতা তাঁহার হৃদয়ের প্রতিধ্বনি, এ পুষ্পিত, অলীক বচন নয়; এ চয়ন-করা গাঁথা ফুলের মালা নয়; এ হৃদয়ের রক্ত হইতে সদ্যঃপ্রস্ফুটিত বিকচকুসুম, এ সত্যবস্তু, এ চির-আনন্দ-ধারা। কি অধ্যাত্মতত্ত্ব, কি স্বদেশপ্রেম, কি জনহিতৈষণায়, কি প্রেমের কবিতায়, এমন কি সামান্য সামান্য বিষয়েও তিনি উচ্চঅঙ্গের কবিতা সকল লিখিয়া গিয়াছেন। এমন কি বিষয় আছে, যে সম্বন্ধে তিনি প্রাণস্পর্শী কবিতা সকল লিখিয়া যান নাই? "জাতিতে কৈবর্ত্ত নাম মহেশ সর্দ্দার" এবং "বিধবার ছেলে" ইহার ভিতর কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য! ঘটনা অতিতুচ্ছ, বলিবার কিছু নাই, কিন্তু কি মনোমুগ্ধকর!

এই সকল কবিতার লেখক যদি কবিশ্রেষ্ঠ না হন, তবে আর বাঙ্গালায় কবি কয়জন আছেন? নিঃসন্দেহ, পিতৃদেব বাঙ্গালা-দেশের একজন উৎকৃষ্ট কবি ছিলেন। তিনি ত চলিয়া গেলেন; ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র ভাব, হিংসা-দ্বেষ আর তাঁহাকে স্পর্শ করিবে না। তাঁর কবিতা সকল বাঙ্গালা ভাষার অক্ষয় রত্ন-ভাণ্ডারে সমাদরে স্থান প্রাপ্ত হইবে। উৎসাহী ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারকের উদ্দীপনাপূর্ণ কবিতা বলিয়া এ দেশের ছাত্রবৃন্দের পাঠ্যপুস্তকের তালিকায় এক "নির্ব্বাসিতের বিলাপ" ব্যতীত আর কোন কবিতা পুস্তকে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই; কিন্তু সে-খানিই হইল তাঁহার কাঁচা

হাতের—১৬।১৭ বৎসরের বালকের রচনা—সেইখানি আই,এ পরীক্ষার পাঠ্য।

পিতৃদেব যে বঙ্গভাষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বক্তা ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমরা তাঁহার তিন ঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছি—চারি সহস্র লোক নিঃস্পন্দ ভাবে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় বক্তৃতা শ্রবণ করিতেছে; তিনি শ্রোতার চিত্ত কখন উৎসাহে পূর্ণ করিতেছেন, কখন তাহাদিগকে কাঁদাইতেছেন, কখন হাসাইতেছেন; এ কি অভিনয়! তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে প্রাণের কথা—তাঁহার ভাষা, সরল সুন্দর, তাঁহার বাণী সজীব সত্য। এ সকল বক্তৃতার প্রভাব কি প্রকার হইত, তাহা বর্ণনা করা সেই আড়ম্বরশূন্য মহাপুরুষের শ্রাদ্ধবাসরে উল্লেখযোগ্য বিষয় নয়। প্রাণের প্রবল আবেগ ও উদ্দীপনা তাঁহার বক্তৃতার উৎস ছিল।

লেখকরূপে গদ্য-সাহিত্যে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে। তিনি উপন্যাস, প্রবন্ধ, ধর্ম্মোপদেশ বিস্তর রাখিয়া গিয়াছেন। সে সকলের মূল্য নিরূপণ করিবার ভার পাঠকসাধারণের উপর। তাঁহার রচনা সারগর্ভ, সরস, সরল, প্রাণস্পর্শী। তিনি জীবনচরিত লিখিয়াছেন, উপন্যাস লিখিয়াছেন; সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। কি গদ্য-সাহিত্যে, কি কাব্যজগতে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে।

কিন্তু এ সকল শক্তি তাঁহার জন্মগত অধিকার।—তাঁহার যে সকল গুণ নিজস্ব ছিল, তাহার উল্লেখ করিব। কবি-হিসাবে পিতা অদ্বিতীয় কবি নন্। ঔপন্যাসিক-হিসাবে তিনি অদ্বিতীয় নহেন, অদ্বিতীয় বক্তা নাও হইতে পারেন; কিন্তু হৃদয়ের বিশালতায়, ঐকান্তিকতায় তিনি কোন মহাপুরুষ অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। এমন কি, যে বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের হৃদয়ের বিশালতার কথা বলিতে গিয়া পিতা আমার তন্ময় হইয়া যাইতেন, সেই বিদ্যাসাগরের মতই তাঁর হৃদয়টা বিশাল ছিল। পরকে তেমনি করিয়াই ভালবাসিতেন, তেমনি অর্থব্যয়ে মুক্তহস্ত, তেমনি নির্লোভ, তেমনি নির্ভীক্, তেমনি সাহসী, তেমনি পরহিতৈষী;—উপরন্তু এমন বিনয়, এমন করিয়া গুণীর চরণে মস্তক লুণ্ঠিত করা কেহ কি দেখিয়াছে? জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহার মুখের ভাষাই ছিল—"এই অধম, এই অপদার্থ লোককে কেন মানুষ এত ভালবাসে?" আমার মাতা তাঁর মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বেও তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছেন যে, "তুমি বালক, বৃদ্ধ, যুবা, সকলের কাছে কেবল বল,—'এই অধম! এই হতভাগা!' সকলে এতে মনে করবে না জানি তুমি কি মহাপাতকী! এমন করে বলা আমার সহ্য হয় না।" তিরস্কৃত হয়ে দীন ভাবে বল্লেন,—"তুমি রাগ করছ? আচ্ছা, তবে আমি আর বলব না।" সে-দিন বাবার বিলাতের ডায়েরি পড়্‌তে পড়্‌তে এক জায়গায় দেখেছি—বিলাত যাবার সময় জাহাজে একদিন দুর্গামোহনবাবু তাঁকে বলেছেন,—"ওহে, তুমি রাত দিন নিজেকে 'আমি পাপী! আমি অধম!' বল কেন? কই, আমরা ত কখনও শুনি নাই যে, তুমি চুরি বাট্‌পাড়ি করেছ—ও-রকম কথা বল কেন?"—বাবার আজীবন এই বুলি ছিল। এ তাঁর মুখের বুলি নয়,

তাঁর অন্তরের বিশ্বাস ছিল যে, তিনি আদর্শের অনেক নীচে; যা হওয়া উচিত ছিল, তা হইতে পারেন নাই। এই গুণটি সম্পূর্ণ আমার বাবার বিশেষত্ব; তাঁর পিতা মাতার ঠিক্ ইহার বিপরীত ভাব ছিল। বাবার মস্তক গুণীর চরণে লুণ্ঠিত; কিন্তু তাঁহারা সহজে কাহারও প্রশংসা করিতে চাহিতেন না। বাবা ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ করাতে তাঁহাদের কষ্টের একশেষ হইয়াছিল। ঠাকুরদাদা ছেলের প্রাণ সংহার করিবেন বলিয়া মনঃস্থ করিয়াছিলেন। ঠাকুরমা কখন কখন অজস্র গালাগালি দিতেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রহণ করিবার পর ঠাকুরদাদা এ জীবনে আর পুত্রের নাম মুখে উচ্চারণ করেন নাই;—"সে পাজিটা!" "সে হতভাগাটা!" ইহাই ছিল বাবার আদরের নাম; বাবা সেই ডাকেই কৃতার্থ হইতেন। কিন্তু অপরে বাবার নামে কিছুমাত্র শ্লেষোক্তি করিলে আর অব্যাহতি ছিল না। তিনি নিজে তাঁহার পুত্রকে যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিতেন, আর কাহারো কিছু বলিবার অধিকার ছিল না।

বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্; না, প্রকৃত ধর্ম্মভাব বিনয় দেয়। ধর্ম্মই বাবাকে বিনয়ে ভূষিত করিয়াছিল। বাবার বিনয়ের চরম দৃষ্টান্ত দিব? আমরা তিনটি বোন ছিলাম, কিন্তু একমাত্র ভাই। বাবা চিরদিন মেয়ে-তিনটিকে আদর দিয়া আসিয়াছেন, এবং পুত্র পুরুষ-জাতীয় জীব, এই অপরাধে বোধ হয়, কোন দিনই বাবার আদর পায় নাই। বাবা মৃত্যুশয্যায় সে ক্ষোভও আর রাখিয়া যান নাই। পুত্রের বিবিধ সদ্গুণ ও তাঁর নীরব সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া, একদিন কাছে ডেকে বলেন,—"বাবা, তুমি আমার সবই কর্‌ছ, কত সেবা কর্‌ছ; তোমার এত গুণ, আমি তা কখনও স্বীকার করি নাই, দেখি নাই, অবজ্ঞা করেছি; আমি চিরদিন তোমায় খর্ব্ব করে রেখেছি,—আমার এই অপরাধ বাবা, তুমি ক্ষমা কর!" এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আমার মা তিরস্কার করে বল্‌লেন,—"বাপ হয়ে ছেলের কাছে ক্ষমা চেয়ে ওর অকল্যাণ কর্‌ছ কেন? ওর সর্ব্বনাশ কর্‌ছ কেন? ও-কথা মুখে আন্‌তে আছে?" বাবার কাছে হীন কেহ ছিল না, হেয় কেউ নয়।

আর কি দেখেছি?—বাবার দুর্জ্জয় মনের বল! বাবা বিলাত-গমনের পূর্ব্বে বড় এলোমেলো ছিলেন, শৃঙ্খলা-পারিপাট্যের প্রতি একেবারে দৃষ্টি ছিল না। ইংলণ্ডে গিয়া ইংরাজ-জাতির নিয়ম-নিষ্ঠা এবং পারিবারিক ব্যবস্থা তাঁর অত্যন্ত ভাল লাগে। তাঁর দৃঢ় প্রতীতি জন্মে যে, ইংরাজ-জাতি এই গুণেই এত বড় এবং এরূপ কর্ম্মকুশল। তখনই সংকল্প করিলেন, এই গুণটি আয়ত্ত করিতে হইবে। অমনি পরিচ্ছন্নতা, নিয়ম-নিষ্ঠা সময়জ্ঞান গঠন করিয়া লইলেন। আর এক তিল ব্যত্যয় নাই, কোন কাজে ভুল নাই; জীবন যন্ত্রের মত নিয়মাধীন করিয়া লইলেন। ঘড়ীর ভুল হইত, কিন্তু বাবার এক মিনিট ভুল হইত না। যে কথা সেই কাজ—চিঠি যে লিখিবে, সেই ঠিক্ সময়ে উত্তর পাইবে। বাবা ছয় মাস মাত্র বিলাতে ছিলেন, তাহার প্রভাব ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত—জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত জীবনে স্থায়ী হইয়াছিল। লোকে দশ বৎসর বিলাত-বাস করিয়াও ইংরাজ-জাতির নিয়ম-

নিষ্ঠা, কার্য্যতৎপরতা শিক্ষা করিতে পারে না। বাবা যেন সিদ্ধ পুরুষ! যে বাবার উপর নির্ভর করিত, তারই আশা পূর্ণ করিতেন। মনের উপর তাঁর অসীম কর্ত্তৃত্ব ছিল। তিনি ভাবিতেন মনকে যা বলি, মন তাহা করিবে না? তিনি কথায় কথায় মনের কাণ মলিয়া দিবার কথা বলিতেন। তাঁর দুর্জ্জয় প্রতিভা, দুর্দ্দম সাহস। মিন্‌মিনে কথা—ভিজে ভিজে কাজ এ সকল তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল; তিনি অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা লইয়া একেবারে অগ্নিময় হইয়াছিলেন।

কি দুরন্ত শ্রমই তিনি করিয়াছেন! তাহা অবর্ণনীয়, মানুষের রক্ত-মাংসের দেহে তাহা সহ্য হয় না। আমি নিজে তাঁহার কার্য্য এখন স্মরণ করিলে শিহরিয়া উঠি। এ কি মানুষের বল! না, ভূতগ্রস্ত ব্যক্তির প্রচেষ্টা! আমি দেখেছি, তিনি সমস্ত রাত্রি একমনে খস্‌খস্ করিয়া লিখিয়া চলিয়াছেন। ঘুমাইতে ঘুমাইতে রাত ১২টার সময় চাহিয়া দেখি বাবার কলম রেলগাড়ীর মত ছুটিয়াছে—কেবল খস্‌খস্ খস্ শব্দ, আর মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বামহস্তে কাগজ সরাইতেছেন। রাত ২টায় চাহিয়া দেখি, তখনও কলম দৌড়িতেছে, ৪টায় লেখা শেষ ও শয়ন। আবার ৫½টায় উঠিয়া স্নান-উপাসনা করিয়া বাহিরের কাজে ছুটিলেন। এমন ত সর্ব্বদাই হইত—প্রাতে উপাসনা, দ্বিপ্রহরে আলোচনা, সন্ধ্যায় হয় ত ২।৩ ঘণ্টা ব্যাপী বক্তৃতা। তাহাতে এত পরিশ্রম হইত যে, স্বর ভঙ্গ হইত, গলা বসিয়া যাইত, গাত্রে বেদনা হইত; আবার প্রাতে যে কে সেই! আমরা যদি এত পরিশ্রম করিতে বারণ করিতাম,—বলিতেন, দুই খানি কাগজ বাহির করিতে হইবে, লেখক নাই। ছাপাখানায় যাইতে হইবে, প্রুফ দেখিতে হইবে, তাড়া দিয়া কাগজ বাহির করিতে হইবে; যত বক্তৃতা, আলোচনা সবই করিতে হইবে। মানুষ একজন, তাঁহার না আছে আহার, না আছে নিদ্রা! দেশে দেশে প্রচার করিবেন, তা হয়, তৃতীয় শ্রেণী, না হয় মধ্যম-শ্রেণীর গাড়ীতে গমন। ভিড়ের মধ্যে বসিয়া থাকা, না শয়ন, না আহার, না বিশ্রাম; ট্রেণ হইতে নামিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া হয় উপাসনা করা, না হয় বক্তৃতা করা। বিচিত্র আর কি, যে তিনি সর্ব্বদাই কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত হইবেন। মানুষের দেহে এত অত্যাচার, কত আর সয়? কিন্তু এ যে তাঁর জীবনের ব্রত। যৌবনের প্রারম্ভে লিখিয়াছিলেন,—

আমি বড় দুঃখী তাতে দুঃখ নাই,
পরে সুখী করে সুখী হতে চাই;
নিজে ত কাঁদিব—কিন্তু মুছাইব
অপরের আঁখি, এই ভিক্ষা চাই।
সত্য—ধন মান চাহে না এ প্রাণ,
যদি কাজে আসি তবে বেঁচে যাই,

*　　*　　*

খাটিতে বাঁচিব,খাটিয়া মরিব—
এই বড় আশা পূর্ণ কর তাই।

খাটিবার জন্য বেঁচে ছিলেন; খাটিয়াই মারা গেলেন, তাতে তাঁর প্রাণের আশা পূর্ণ হইয়াছে। বাবা যখন যে কাজে হাত দিতেন, দেহ-মনঃপ্রাণ দিয়া লাগিয়া যাইতেন। যেন সেই কাজটি ছাড়া পৃথিবীতে তাঁর আর কিছু করিবার নাই। সিটি-কলেজ যখন বসে, তখন মুগের মত তাঁর দৌড়াদৌড়ির কথা মনে

আছে,—ব্রাহ্মবালিকা-শিক্ষালয় যখন প্রতিষ্ঠা করেন, তখন আহার-নিদ্রার সময় ছিল না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠান-সকল বাবার কীর্ত্তিস্তম্ভের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। আজ একবার ভাবিয়া দেখি, ক্ষীণদেহ, অনাহারক্লিষ্ট মানুষের এই উদ্যোগ!

বিগত কয়েক বৎসর রোগশয্যায় বাবার চূড়ান্ত সেবা, চূড়ান্ত যত্ন হইয়াছে। যখন খাটিতেন, তখন উদরে অন্ন ছিল না, শয্যা ছিল না, চক্ষে নিদ্রা ছিল না, বিশ্রাম ছিল না, ক্লান্তি ছিল না, এত শ্রমের শক্তি বিধাতা তাঁহাকে দিয়াছিলেন!—আর প্রাণের অফুরন্ত প্রেম তাঁহাকে শ্রমের ভিতর পরমানন্দ আনিয়া দিয়াছিল। প্রেমিক ভিন্ন যথার্থ কর্ম্মী কে হইতে পারে? এমন করিয়া ভালবাসিতে কয়জন পারে? মৃত্যুর দিনও সে প্রেমে ভাঁটা পড়ে নাই;—কর্ম্মশক্তি বহুদিন পূর্ব্বে গিয়াছিল, মস্তিষ্কের শক্তি হ্রাস হইয়া গিয়াছিল, কিছু করিতে পারেন নাই; কেবল পড়িয়া পড়িয়া ভালবাসিয়াছেন, চক্ষের জল ফেলিয়াছেন, সকলকে বুকে ধরিয়াছেন; কোন response ( সংজ্ঞা ) যখন ছিল না, প্রেমের ডাকে মুমূর্ষু কর্ণ সাড়া দিয়াছে, যতক্ষণ হৃৎপিণ্ড আপনার কাজ করিয়াছে, বাবার প্রেমিক হৃদয় প্রেমের ডাকে সাড়া দিয়াছে। সন্তানমাত্রই পিতার আদরের—কিন্তু এই অধম কন্যা তাঁর কি আদর সম্ভোগ করিয়াছে, তাহা কস্মিন্ কালে এ দুর্ভাগ্য দেশের কোন কন্যার ভাগ্যে ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ। শৈশবে একটি প্রার্থনা আমার অপূর্ণ থাকে নাই, একটিও সদ্ভাবের প্রকাশ আমার উপেক্ষিত হয় নাই। নারীর কত বড় গৌরব বাবাই তাহা শিখাইয়াছেন; নারীর অধিকার কি অসীম পিতাই তাহা দেখাইয়াছেন। কিসে আমার মন বড় হবে, কিসে আমার চিন্তাশক্তি বাড়িবে, এই বাবার নিত্য চেষ্টা ছিল। "মন বাড়্‌তে দাও, মন বাড়্‌তে দাও", এই তাঁর কথাই ছিল।

বাবা গো! আজ তুমি কোন্ লোকে? বাড়্‌তে দিয়াছিলে তুমি আমার মনকে, আর আমার জ্ঞান-বুদ্ধিকে। বাবা তোমার মনের মত বাড়িল কই? এত বাড়াইতে আমাকে যে, আমি দু লাইন লিখিলে তুমি দশ হাত বুক করিয়া বলিতে "মেয়ে বাপের চেয়ে লেখে ভাল!" বাবা, তুমি কোথায় আর তোমার সন্তানেরা কত নীচে! আজ বেদের ঐ মন্ত্রের মত বলি,—

"তোমার যে আত্মা দূরে দূরতম দেশে আজ চলিয়া গিয়াছে, আমরা তাহাকে পুনরাহ্বান করিতেছি, তাহা আমাদিগের মধ্যে বাস করুক্ ও জীবিত থাকুক।"

পিতঃ, তুমি যে লোকেই গিয়া থাক, এসো, আমাদের ভিতর আবার জীবিত হও; এস বাবা, আমাদের মনের ভিতর, আমাদের জীবনের ভিতর, তুমি আমাদের ভিতর ফুটে উঠ, যেন আমাদের তোমার মত একটু দেখায়!! তুমি যে লোকেই থাক, তোমার অপার স্বর্গ নিশ্চিত!

—"তোমার দুঃখিনী হেম।"

( তত্ত্বকৌমুদী হইতে)

# সাময়িক প্রসঙ্গ।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী।—যে সকল মহাত্মগণ নরনারীর সেবার জন্ম ও ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য-সাধনের জন্ম জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, সেই সকল মহাত্মাদের মধ্যে একজন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী! ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য- ও তাঁহার প্রীতি-সাধন-ব্রতধারী এই তেজস্বী, কঠোর সংযমী, আত্মোৎসর্গ-কারী, সুপণ্ডিত, সুকবি, সুবক্তা, দেশহিত-কারী সাধক তাঁহার মর্ত্ত্যজীবনের কার্য্য শেষ করিয়া মর্ত্ত্য-দেহ ত্যাগ করিয়া আজ অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন! -এ কথা আজ বঙ্গবাসী নরনারী স্মরণ করিলে অশ্রু সংবরণ করিতে পারে না।

৩০শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার বেলা ২টা ৫৫ মিনিটের সময় ৭২ বৎসর বয়সে কঠোর ত্যাগী মহাপুরুষের মহাযাত্রা সংঘটিত হইয়াছে।

বঙ্গমাতার উজ্জ্বল রত্ন মাতৃক্রোড় শূন্য করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন সত্য, কিন্তু—

"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।"

সেই সেবাব্রতধারী বীর পুরুষসিংহ যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, প্রত্যেক মানবের অন্তরের মধ্যে, ভারতের ইতিহাসের পৃষ্ঠায়, বাঙ্গালার কাব্যে ও জগতের মহাপুরুষদিগের জীবন-চরিতের মধ্যে তাঁহার সেই আজীবন সাধনার অমর কীর্ত্তি, তাহাই তাঁহাকে চিরদিন সঞ্জীবিত করিয়া রাখিবে।

শাস্ত্রি মহাশয় এই সুদীর্ঘকাল ভগবানের দাসরূপে দেশের ও দশের বিবধ কল্যাণে দেহ, মন, প্রাণ উৎসর্গ করিয়া খাটিয়া গিয়াছেন। কর্ম্ম-জগতের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে তিনি মহাকর্ম্মী, সমাজসংস্কারক, সুলেখক, সুকবি! ধর্ম্মজগতের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে তিনি যথার্থ ধার্ম্মিক! ত্যাগের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে তিনি সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী! জ্ঞানের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে তিনি মহাজ্ঞানী! পাণ্ডিত্যের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে তিনি বহুশাস্ত্রবিৎ শাস্ত্রী! ভগবানে যোগযুক্ত আত্মদিগের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে, তিনি মহাযোগী ছিলেন।

যিনি এই মহাপুরুষের মহাযাত্রা দর্শন করিয়াছেন, তিনি তাঁহার সেই সদানন্দ সর্ব্ব-যাতনাশূন্য শান্তিপূর্ণ হাস্যমুখ দেখিয়া ভক্তের মহাপ্রয়াণ কি মধুময়, তাহা অনুভব করিয়াছেন ও সেই দৃশ্য দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

যখন পুষ্পমাল্যে শোভিত ও চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া শ্বেত পদ্মদল-মধ্যে তাঁহাকে শায়িত করিয়া ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে শত শত লোক তাঁহাকে লইয়া শ্মশানে যাইতে ছিলেন, তখন সেই ভক্তের মুখশ্রীতে যে আনন্দময় ভাব অনুভূত হইয়াছিল, তাহা ব্যক্ত করিতে পারা যায় না; কেবল তাঁহারই বাক্যের উক্তিদ্বারা সেই ভাব কতকটা প্রকাশ করা সম্ভব হইতে পারে;—তিনি একসময় লিখিয়াছিলেন—

"সংসার-সরসী জলে আমি যেন পানা,
মূল নাই, বাঁধা নাই,
সর্ব্বদা স্বাধীন রহি,
যথা ইচ্ছা ভেসে যাই, নাহিক ঠিকানা!
প্রভুর যে দিন ইচ্ছা লবে মোরে তুলে,
বাঁধা নাহি, নাহি টান,
ছিঁড়িতে হবে না প্রাণ,
তাঁরি আছি, তাঁরি রব একূলে ওকূলে!"

বাস্তবিকই তাঁহার শেষ মুখশ্রীতে এই ভাবটাই যেন স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

আজ বঙ্গবাসী যে অমূল্য নিধি হারাইয়া শোকে অধির হইতেছে, তাহার পূরণ কত যুগে সম্ভব তাহা জানি না! দয়াময় সেই মহাপুরুষের জীবনপ্রভাব দেশবাসী সকলের মধ্যে সঞ্চারিত করুন্। দুঃখিনী ভারতজননীর অশ্রুজল মুছাইতে এই বীর-পুরুষদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া দেশবাসী উত্থিত হউক্। বাঙ্গলার নারীসমাজ মহাত্মা শাস্ত্রীর নিকট বিশেষ ঋণী। যখন কতিপয় মহাত্মা বঙ্গনারীর দুর্গতি দূর করিবার জন্য মহা উৎসাহে শত বাধা-বিঘ্ন পদদলিত করিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন এই মহাপুরুষ তাঁহাদের সহিত সহকর্ম্মিরূপে নারীর অশেষ হিতসাধন করিয়াছেন! বামাবোধিনীর পাঠিকা-ভগিনীগণ শাস্ত্রিমহাশয়ের অমিয়মাখা লেখনীনিঃসৃত অমূল্য কবিতা ইঁহার তিরোধানের কয়েক দিন পূর্ব্বেই পাঠ করিয়াছেন। হায়! তখন আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই, এত শীঘ্র এই দেবপ্রতিম সাধুমহাত্মাকে আমরা হারাইব।

এরূপ মহাপুরুষের জীবনের আলোচনা, তাঁহার গুণ-কীর্ত্তন একদিনে শেষ করা সম্ভব নয়। বিধাতা তাঁহার ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন্ ও তাঁহার শোকসন্তপ্ত পত্নী-পুত্র-কন্যা ও আত্মীয়-স্বজনের প্রাণে সান্ত্বনা দান করুন্।

---

# নিরুপায়।

একটি মানবদেহে একখানি ক্ষুদ্র প্রাণ
অগণ্য আকাঙ্ক্ষা দিয়া সৃজিয়াছ, ভগবান্!
রঙীন্ কল্পনা-শত আশার আলোকে ভোর,
অক্ষম হৃদয়ে দেহে জড়াইছে মায়া-ডোর।
সেই মায়া-মন্ত্রে মুগ্ধ আপনারে ভুলে যাই,
বর্ত্তমান ত্যাগ করি, সদাই সমুখে চাই!
ভবিষ্যের আশাগুলি বাঁধিয়া সহস্র পাকে,
টানিছে প্রাণেরে নিত্য কল্পিত সুখের দিকে।
নিজেরে ভাসায়ে দিয়া সে আশার স্রোতোবলে
দুরলভ জীবনের সময় যেতেছে চলে!

শ্রীঅমিয়া গুপ্তা।

---

# ভ্রম সংশোধন।

১। ভাদ্রমাসের সংখ্যায় "গৃহিণীপণা" প্রবন্ধের ১৪৯ পৃষ্ঠাস্থিত দ্বিতীয় প্যারায় "অধিকাংশ স্থলে সংসারে শ্বশ্রূ বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়া" ইত্যাদির স্থানে "অধিকাংশ স্থলে সংসারে জননী বা জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতৃজায়া" ইত্যাদি হইবে।

২। বিগত আষাঢ়-সংখ্যায় ৯৭ হইতে ১০৪ পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠাঙ্ক ১০৫ প্রভৃতি না হইয়া পুনরায় ৯৭ সংখ্যা পৃষ্ঠাঙ্ক দেওয়া হইয়াছে এবং পরবর্ত্তী দুই সংখ্যাতেও ঐ ভুল অনুযায়ী পৃষ্ঠাঙ্ক দেওয়া হইয়াছে। ভাদ্র-সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠার অঙ্ক ১৭৬ হওয়া উচিত; এজন্য বর্ত্তমান সংখ্যায় ভ্রম-সংশোধন করিয়া ১৭৭ হইতে পৃষ্ঠাঙ্ক আরম্ভ হইল।

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

# বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 675. November, 1919.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৭ বর্ষ। ৬৭৫ সংখ্যা। | কার্ত্তিক, ১৩২৬। নবেম্বর, ১৯১৯। | ১১শ কল্প। ৪র্থ ভাগ।


## গানের স্বরলিপি।

### প্রভাতী—উপাসনা।

ভৈরবী—ঠুংরি।

আজি এ প্রভাতে, উঠিনু জাগিয়া
তোমারে করিয়া প্রণতি,
দেহ গো হৃদয়ে নবীন আশা,
বাহুতে দেহ গো শকতি।
জীবনে মরণে, মননে বচনে
মতি গতি যেন রহে গো চরণে,
অবিরত যেন রাখি গো স্মরণে—
জীবন-সাধনা মহতী।

বরণে গন্ধে ছন্দে গীতে
আঁধারে আলোকে প্রদোষে নিশীথে
অবিরত যেন বহি আনে চিতে
তোমায়ই অনুভূতি।
(কর) আকাশের মত কান্ত বিমল,
শিশিরের মত শুভ্র শীতল,
প্রভাতের মত আলোক-উজল
দেহ গো প্রাণে ভকতি।

(কর) কুসুমের মত পূত নিরমল,
সুরভির মত পীযূষ-তরল,
বাতাসের মত মুক্ত সরল
দেহ গো অবাধ মুকতি।

স্থির চেতনা প্রাণের প্রাণ,
উচ্চ লক্ষ্য হৃদয়ে আন,
দৈন্য লজ্জা কর হে ম্লান ;
জয় জয় তব জয়তি !

রচয়িতা—কথক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন।

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
II সা দা। পা পা। পা -া। মপা -দণা I দা পা। মা -া।
আ জি এ প্র তা ০ তে০ ০০ উ ঠি হু ০

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। মা -পা। মপা -দা I পা মা। জ্ঞা -ঋা। জ্ঞা -ঋা। জ্ঞা -মা I
ঙ্কা ০ গি০ য়া তো মা রে ০ ক ০ রি য়া

২´ ৩ ০ ১ II ২´ ৩
I জ্ঞা ঋা। সা -া। -া -া। -া -া I ঋা সা। ণ্দা ণা।
প্র ণ তি ০ ০ ০ ০ ০ দে হ গো হৃ

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। সা -জ্ঞা। -া -ঋা I জ্ঞা মজ্ঞা। -মা মা। জ্ঞা -া। সা -া I
দ য়ে ০ ০ ন বী০ ০ ন আ ০ শা ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I দা ণা। সা সা। সা -ঋা। জ্ঞা -মা I জ্ঞা ঋা। সা -া।
বা হু তে দে হ ০ গো ০ শ ক তি ০

০ ১
। -া -া। -া -া II
০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
II { মা দা। দা -া। দা -পা। দা পা I পা র্সা। র্ঋা পা।
জী ব নে ০ ম ০ র ণে ম ন নে র

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। র্সা -া। র্সা -া I পা -া। র্সা র্ঋা। র্ঋা -া। র্সা -া I
চ ০ নে ০ ম ০ তি গ তি ০ বে ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I পা -র্সা। র্ঋা র্সা। পা পা। দা দা। I দা দা। দা দা।
ন ০ র হে গো চ র ণে অ বি র ত

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। পা -া। পা মা I পা পা। দা -দপা। মা -া। -া মা I
যে ০ ন রা খি গো স্ম ০০ র ০ ০ ণে

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I মা পা। পা দা। পা -া। মা -পমা I জ্ঞা রা। জ্ঞা -া।
জী ব ন সা ধ ০ না ০০ ম হ তী ০

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। -া -া। -া -া I *(১) I ঋা ঋা। ঋা ঋা। ঋা -া। ঋা -জ্ঞা I
০ ০ ০ ০ দে হ গো হৃ দ ০ য়ে ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I সা জ্ঞা। ঋা ঋা। -সা -া। ধ্‌া -া I *(২) I দ্‌া ণ্‌া। সা -া।
ন বী ন আ ০ ০ শা ০ বা হু তে ০

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। সা -ঋা। জ্ঞা মা I জ্ঞা ঋা। সা -া। -া -া। -া -া I
দে ০ হ গো শ ক তি ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
*(৩) I জ্ঞা জ্ঞা। জ্ঞা রা। জ্ঞা -া। জ্ঞা -া I জ্ঞা পা। মা -মজ্ঞা।
দে হ গো হৃ দ ০ য়ে ০ ন বী ন ০আ

১ ২´ ৩ ০ ১
। -া -াপ। জ্ঞা -া I *(৪) I দ্‌া ণ্‌া। সা -া। সা -ঋা। জ্ঞা মা I
০ ০ শা ০ বা হু তে ০ দে ০ হ গো

২´ ৩ ০ ১
I জ্ঞা ঋা। সা -া। -া -া। -া -া II
শ ক তি ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
II দ্‌া ণ্‌া। সা সা। সা -া। সা সা I সা জ্ঞা। জ্ঞা রা।
ব র ণে গ ন্ধে ০ ছ ন্দে গী তে ঝা রা

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। জ্ঞা -াম। মজ্ঞা -াপ I সা ঋা। ঋা ঋা। ঋা -া। ঋা জ্ঞা I
রে ০ আ০ ০ লো কে প্র দো ষে ০ নি শী

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I -সজ্ঞা -ঋা। -সা -া। -া -া। -া -া I সা -দা। দা দা।
০থে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ অ বি র ত

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। পা -া। পা -মা I ণা ণা। দা দপা। মা -া। -া -া I
যে ০ ন ব হি আ নে ০চি ত্তে ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I জ্ঞা -দা। দা -াপ। পপা পা। -া -মা I জ্ঞা রা। জ্ঞা -া।
তো ০ মা ০ র ই ০ অ নু ভু তি ০

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। -া -া। জ্ঞা জ্ঞা I ।দা দা। দা দা। দা -ণা। -দা -ণা I
০ ০ (ক র) আ কা শে র ম ত কা হু

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I র্সা জ্ঞা। ঋা র্ঋা। র্সা -া। র্সা -া I ণা -া। র্সা র্ঋা।
বি ম ০ ল শি ০ শি ০ রে র ম ত

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। র্ঋা -া। র্সা -া I ণা র্সা। র্ঋা -র্সা। -া ণর্সা। -ণা -দা I I
ও ০ ত্র ০ শী ত ল ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I দা দা। দা দা। দা দা। দা -া I দা পদা। পর্সা পদা।
প্র ভা তে র ম ত আ ০ লো ০ক উ০ জ্ব০

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। দা -া। পা -া I দা দপা। মা মা। -া -া। -া -পমা I
ল ০ ০ ০ দে হ০ গো প্রা ০ ০ ০ ণে০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I জ্ঞা ঋা। জ্ঞা -া। -া -া। জ্ঞা জ্ঞা I ঋা ঋা। ঋা ঋা।
ভ ক তি ০ ০ ০ (ক র) কু সু মে র

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। ঋা -া। ঋা -জ্ঞা I -সা -জ্ঞা। ঋা ঋা। সা -া। দ্‌া -া I
ম ০ ত পূ ০ ত নি র ম ০ ল ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I দ্‌া ণ্‌া। সা সা। সা -ঋা। জ্ঞা মা I -জ্ঞা ঋা। সা সা।
সু র ভি র ম ০ ত পী ০ যূ ষ ত

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। সা -া। সা -া I জ্ঞা জ্ঞা। জ্ঞা রা। জ্ঞা -া। জ্ঞা জ্ঞা I
র ০ ল ০ বা তা সে র ম ০ ত মু

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I -া পা। মা মজ্ঞা। -া -া। জ্ঞা -া I দ্‌া ণ্‌া। সা সা।
০ জ স ন্ধ০ ০ ০ ল ০ দে হ গো অ

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। সা -ঋা। জ্ঞা -মা I জ্ঞা ঋা। সা -া। -া -া। -া -া I
বা ০ ধ ০ মু ক তি ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I দা -া। দা দা। দা -া। দা ণা I ণা -া। র্সা -া।
স্থি ০ র চে ত ০ না প্রা ণে ০ র ০

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। র্সা -ণা। র্সা -া I র্সা -া। র্সা -া। র্সা -া। র্সা -া I
প্রা ০ ণ ০ উ ০ চ্ছ ০ ল ০ ক্য ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I পা পা। র্সা -া। র্জা -া। র্ঝা -র্সা I দা -া। দা -া।
হৃ দ য়ে ০ আ ০ ন ০ দৈ ০ ন্য ০

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। পা -া। পা -া I পা দা। পা -া। পদা -া। পা -মা I
দ ০ ন্ধা ০ ক র হে ০ ম্লা০ ০ ন ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I পা পা। দা পা। মা -া। পা -া I জ্ঞা মা। জ্ঞা -া।
জ য় জ য় ত ০ ব ০ জ য় তি ০

০ ১
। -া -া। -া -া I
০ ০ ০ ০

দ্রষ্টব্য—"জয়তি" পর্য্যন্ত গাহিয়া, তাহার পর উপরে লিখিত *(১), *(২), *(৩) আর *(৪) চিহ্নযুক্ত চারিটি পংক্তি গেয়.।

---

# অষ্টাবক্র গীতা।

( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর )

শুদ্ধস্ফুরণরূপস্য দৃশ্যভাবমপশ্যতঃ।
ক্ব বিধিঃ ক্ব চ বৈরাগ্যং ক্ব ত্যাগঃ ক্ব শমোঽপি-
বা ॥৭১॥

যিনি শুদ্ধচৈতন্যরূপী ও স্বপ্রকাশ, যাঁহার বহির্জগতের বোধ বিগত হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে বিধি বা বৈরাগ্য, ত্যাগ বা শম, কিছুই নাই।৭১।

স্ফুরতোঽনন্তরূপেণ প্রকৃতিং চ ন পশ্যতঃ।
ক্ব বন্ধঃ ক্ব চ বা মোক্ষঃ ক্ব হর্ষঃ ক্ব বিষাদতা
॥৭২॥

যে আত্মজ্ঞানী অনন্তরূপে প্রকাশিত হন্, দেহমন-বুদ্ধি প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিষয়ে যাহার দৃষ্টি সংসক্ত হয় না, তাঁহার সংসার-বন্ধন নাই, মোক্ষের ইচ্ছাও নাই, হর্ষও নাই, বিষাদও নাই ॥৭২॥

বুদ্ধিপর্য্যন্তসংসারে মায়ামাত্রং বিবর্ত্ততে।
নির্মমো নিরহঙ্কারো নিষ্কামঃ শোভতে
বুধঃ ॥৭৩॥

স্থূলজগৎ, তাহার কারণ, তাহার ভোক্তা স্থূল-সূক্ষ্ম শরীর প্রভৃতি সমস্তই মায়ার বিবর্ত্তমাত্র; ( জ্ঞানীর এই সকলে কিছুই প্রয়োজন নাই )। অতএব জ্ঞানী নির্মম, নিরহঙ্কার ও নিষ্কাম হইয়া শোভা পান।৭৩।

অক্ষয়ং গতসন্তাপমাত্মানং পশ্যতো মুনেঃ।
ক্ব বিদ্যা ক্ব চ বা বিশ্বং ক্ব দেহোঽহং মমেতি
বা ॥৭৪॥

অবিনাশী সন্তাপরহিত আত্মাকে যিনি দেখিতেছেন, তাঁহার বিদ্যাই বা কি, জগৎই বা কি, দেহই বা কি, আর 'আমি' 'আমার' ইত্যাকার ভাবই বা কি? (তাঁহার এ সব কিছুই নাই) ।৭৪।

নিরোধাদীনি কর্ম্মাণি জহাতি জড়ধীর্যদি।
মনোরথান্ প্রলাপাংশ্চ কর্ত্তুমাপ্নোত্য-
তৎক্ষণাৎ ॥৭৫॥

যে মূঢ়বুদ্ধি দেহাভিমানী পুরুষ অতিপরিশ্রমসহকারে মনের নিরোধ সম্পাদন করে, তাহার নিরোধসমাধির অবসান হইলেই মন নানাপ্রকার সংকল্পবিকল্পে নিরত হয় ও অভিলাষ-প্রলাপাদি ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হয়। এই কারণে জ্ঞানব্যতিরেকে কেবল হঠযোগাদিদ্বারা মনের নিরোধে কোনও লাভ নাই ।৭৫।

মন্দঃ শ্রুত্বাপি তদ্বস্তু ন জহাতি বিমূঢ়তাম্।
নির্বিকল্পো বহির্যত্নাদন্তর্বিষয়লালসঃ ॥৭৬॥

যে দেহাভিমানী মূঢ়পুরুষ হয়, সে বেদান্তশাস্ত্রের অনেক গ্রন্থদ্বারা আত্মস্বরূপ শুনিয়াও দেহাভিমান ত্যাগ করে না। যদ্যপি তাহার অতিপরিশ্রমে উপর উপর ত্যাগের ভাব দেখায়, তথাপি মনে মনে তাহার অনেক বিষয়বাসনা থাকিয়া যায় ।৭৬।

জ্ঞানাদ্গলিতকর্ম্মা যো লোকদৃষ্ট্যাপি কর্ম্মকৃৎ।
নাপ্নোত্যবসরং কর্ত্তুং বক্তুমেব ন কিঞ্চন ॥৭৭॥

যিনি আত্মজ্ঞানের পরিপাকবশতঃ কর্ম্মত্যাগ করিয়াছেন, তিনি লোকদৃষ্টিতে কর্ম্ম করিলেও, বস্তুতঃ কোন কর্ম্ম করিবার অবসর পান না; এমন কি কিছু বলিতেও অবকাশ পান না ।৭৭।

ক্ব তমঃ ক্ব প্রকাশো বা হানং ক্ব চ ন কিঞ্চন।
নির্বিকারস্য ধীরস্য নিরাতঙ্কস্য সর্ব্বদা ॥৭৮॥

সর্বদা নিরাতঙ্ক নির্বিকার ধীর ব্যক্তির অজ্ঞানই বা কি, জ্ঞানই বা কি? তাঁহার বন্ধনমোচনই বা কি? বস্তুতঃ তাঁহার কিছুই নাই ।৭৮।

ক্ব ধৈর্য্যং ক্ব বিবেকিত্বং ক্ব নিরাতঙ্কতাপি বা।
অনির্বাচ্যস্বভাবস্য নিঃস্বভাবস্য যোগিনঃ ॥৭৯॥

জ্ঞানীর স্বভাব কাহারও চিন্তার মধ্যেই আসে না; কারণ, তাঁহার কোন লৌকিকস্বভাবই নাই, তাঁহার ধীর স্বভাবও নাই, বিবেকিস্বভাবও নাই, এমন কি নির্ভয়তাও নাই ।৭৯।

ন স্বর্গো নৈব নরকো জীবন্মুক্তির্নচৈব হি।
বহুনাত্র কিমুক্তেন যোগদৃষ্ট্যা ন কিঞ্চন ॥৮০॥

সর্বত্র আত্মদৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানীর স্বর্গও নাই, নরকও নাই, জীবন্মুক্তিও নাই। অথবা বেশী বলার প্রয়োজন কি? প্রকৃত জ্ঞানদৃষ্টিতে লৌকিক কিছুই নাই ।৮০।

নৈবং প্রার্থয়তে লাভং নালাভেনানুশোচতি।
ধীরস্য শীতলং চিত্তমমৃতেনৈব পূরিতম্ ॥৮১॥

ধীরব্যক্তি লাভের ইচ্ছা করেন না, লাভ না হইলে শোকও করেন না। তাঁহার চিত্ত সর্বদা জ্ঞানামৃতে-পরিপূর্ণ বলিয়া শীতল (অর্থাৎ তাপত্রয় রহিত) ।৮১।

ন শান্তং স্তৌতি নিষ্কামো ন দুষ্টমপি নিন্দতি॥
সমদুঃখসুখস্তৃপ্তঃ কিঞ্চিৎ কৃত্যং ন পশ্যতি ॥৮২॥

কামনাশূন্য জ্ঞানী শান্তপুরুষকে দেখিয়া তাহার প্রশংসা করেন না, অথবা দুষ্ট লোক দেখিয়া নিন্দাও করেন না। তিনি সুখদুঃখে সমানভাবযুক্ত ও নিজেতেই নিজে তৃপ্ত; এজন্য কোন কর্ত্তব্যই দেখেন না ।৮২।

ধীরো ন দ্বেষ্টি সংসারমাত্মানং ন দিদৃক্ষতি।
হর্ষামর্ষবিনির্মুক্তো ন মৃতো ন চ জীবতি ॥৮৩॥

জ্ঞানী সংসারকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখেন না, আত্মদর্শনের জন্যও ব্যাকুল হন না। তিনি হর্ষ ও ক্রোধের অতীত হইয়া বর্ত্তমান থাকেন; তিনি মৃতও নহেন, জীবিতও নহেন।৮৩।

নিঃস্নেহঃ পুত্রদারাদৌ নিষ্কামো বিষয়েষু চ।
নিশ্চিন্তঃ স্বশরীরেঽপি নিরাশঃ শোভতে
বুধঃ ॥৮৪॥

জ্ঞানী পুরুষ পুত্রকলত্রাদির প্রতি মমত্বা-কৃষ্টমানস নহেন। তিনি বিষয়ভোগেচ্ছা-বিরহিত, এমন কি নিজের শরীরের যোগক্ষেম বিষয়েও চিন্তিত হন না; সর্ব্বদাই আশাশূন্য হইয়া শোভা পান।৮৪।

তুষ্টিঃ সর্ব্বত্র ধীরস্য যথা পতিতবর্ত্তিনঃ।
স্বচ্ছন্দং চরতো দেশান্ যত্রাস্তমিতশায়িনঃ ॥৮৫

ধীরব্যক্তি স্বচ্ছন্দে সকল দেশে বিচরণ করেন এবং যখন যেখানে সূর্য্য অস্তমিত হন, সেখানেই শয়ন করেন; এবং যখন যাহা জোটে, তাহার দ্বারাই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। এই-রূপে তিনি সর্ব্বদাই তুষ্টিলাভ করেন।৮৫।

পততূদেতু বা দেহো নাস্য চিন্তা মহাত্মনঃ।
স্বভাবভূমিবিশ্রান্তি-বিস্মৃতাশেষসংসৃতেঃ ॥৮৬॥

জ্ঞানী মহাত্মারা দেহ থাকুক্ অথবা যাউক্, এ বিষয়ে কোন চিন্তাই করেন না। কারণ, তাঁহারা স্বস্বরূপে বিশ্রাম লাভ করিয়া সংসারের সকল কথাই ভুলিয়া থাকেন্।৮৬।

অকিঞ্চনঃ কামচারো নির্দ্বন্দ্বশ্ছিন্নসংশয়ঃ।
অসক্তঃ সর্ব্বভাবেষু কেবলো রমতে বুধঃ ॥৮৭॥

জ্ঞানী আত্মস্বরূপেই আনন্দ অনুভব করিতে থাকেন্; তিনি কিছুই চাহেন না বা রাখেন না; যথেচ্ছ আচরণ করিতে থাকেন; শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বের দ্বারা আকুল হন না। তাঁহার সকল সংশয় দূর হয় এবং তিনি কিছুতেই আসক্ত হন না।৮৭।

নির্ম্মমঃ শোভতে ধীরঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
সুভিন্নহৃদয়গ্রন্থির্বিনির্ধূতরজস্তমঃ ॥৮৮॥

ধীরব্যক্তির কোনরূপ মমতা নাই, তিনি মৃত্তিকা, প্রস্তর ও সুবর্ণে সমদৃষ্টিসম্পন্ন। তাঁহার অজ্ঞানরূপ হৃদয়গ্রন্থি নিঃশেষে ছিন্ন হইয়াছে। রজঃ ও তমোগুণের লেশমাত্রও তাঁহাতে থাকে না;—এইরূপে তিনি শোভা পান।৮৮।

সর্ব্বত্রানবধানস্য ন কিঞ্চিদ্বাসনা হৃদি।
মুক্তাত্মনো বিতৃপ্তস্য তুলনা কেন জায়তে ॥৮৯॥

কোন বিষয়ই ধীরব্যক্তির মনকে আকৃষ্ট করিতে পারে না, তাঁহার হৃদয়ে কোনরূপ বাসনা নাই। আত্মতৃপ্ত মুক্তাত্মার তুলনা ত্রিভুবনে হয় না।৮৯।

জানন্নপি ন জানাতি পশ্যন্নপি ন পশ্যতি।
ব্রুবন্নপি ন চ ব্রূতে কোঽন্যো নির্বাসনাদৃতে ॥৯০

বাসনাশূন্য জ্ঞানী ব্যতিরেকে আর এরূপ কে আছেন, যিনি জানিয়াও জানেন্ না, দেখিয়াও দেখেন না, বলিয়াও বলেন না ॥৯০

ভিক্ষুর্বা ভূপতির্বাপি যো নিষ্কামঃ স শোভতে।
ভাবেষু গলিতা যস্য শোভনাশোভনা-
মতিঃ ॥৯১॥

উৎকৃষ্ট বস্তুর প্রতি যাঁহার ইচ্ছাবুদ্ধি হয় না এবং অপকৃষ্ট বস্তুর প্রতি যাঁহার দ্বেষবুদ্ধি হয় না, এরূপ সমবুদ্ধিসম্পন্ন কামনাশূন্য ব্যক্তি ভিক্ষুই হউন্, আর রাজাই হউন্, সর্ব্বদা শোভা পান।৯১।

ক্ব স্বাচ্ছন্দ্যং ক্ব সঙ্কোচঃ ক্ব বা তত্ত্ববিনিশ্চয়ঃ।
নির্ব্যাজার্জবভূতস্য চরিতার্থস্য যোগিনঃ ॥৯২॥

অকপট সরলভাবযুক্ত চরিতার্থযোগীর স্বাচ্ছন্দ্যই বা কি, আর সঙ্কোচই বা কি, আর তাঁহার তত্ত্বনির্ণয়ই বা কি? (অর্থাৎ তাঁহার কোন বদ্ধভাবই থাকে না)।৯২।

আত্মবিশ্রান্তিতৃপ্তেন নিরাশেন গতার্ত্তিনা।
অন্তর্যদনুভূয়তে তৎ কথং কস্য কথ্যতে ॥৯৩॥

আত্মস্বরূপে বিশ্রামলাভ করিয়া যিনি পরিতৃপ্ত হইয়াছেন এবং এজন্য যিনি আর কিছুরই আশা হৃদয়ে পোষণ করেন্ না এবং তজ্জন্য যাঁহার সকল ক্লেশ অপগত হইয়াছে, এরূপ জ্ঞানী অন্তরে যে আনন্দ অনুভব করেন, তাহা কিরূপেই বা বলা যায় এবং কাহাকেই বা বলা যায়? (অর্থাৎ সে আনন্দ অনির্বাচ্য ও তাহার অধিকারী দুর্লভ।৯৩।

সুপ্তোঽপি ন সুষুপ্তৌ চ স্বপ্নেঽপি শয়িতো ন চ।
জাগরেঽপি ন জাগর্ত্তি ধীরস্তৃপ্তঃ পদে পদে ॥৯৪॥

পদে পদে তৃপ্ত ধীরব্যক্তি সুষুপ্তিতে থাকিলেও সুপ্ত থাকেন না, স্বপ্নাবস্থায় থাকিলেও নিদ্রিত থাকেন না এবং জাগরাবস্থায় থাকিলেও জাগরিত থাকেন না;— অর্থাৎ তিনি তুরীয়াবস্থায় থাকেন; তাহা জাগরাদি অবস্থার ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও, বস্তুতঃ জাগরাদি অবস্থা নহে।৯৪।

জ্ঞঃ সচিন্তোঽপি নিশ্চিন্তঃ সেন্দ্রিয়োঽপি নিরিন্দ্রিয়ঃ।
সুবুদ্ধিরপি নির্বুদ্ধিঃ সাহঙ্কারোঽনহঙ্কৃতী ॥৯৫॥

জ্ঞানী মহাত্মা লোকের নিকট সচিন্ত প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ নিশ্চিন্ত, এইরূপ সেন্দ্রিয় হইলেও নিরিন্দ্রিয়, সুবুদ্ধি হইলেও নির্বুদ্ধি, সাহঙ্কার হইলেও নিরহঙ্কার।৯৫॥

ন সুখী ন চ বা দুঃখী ন বিরক্তো ন সঙ্গবান্।
ন মুমুক্ষুর্ন বা মুক্তো ন কিঞ্চিন্ন চ কিঞ্চন ॥৯৬॥

জ্ঞানী সুখীও নহেন, দুঃখীও নহেন, বিরক্তও নহেন, অনুরক্তও নহেন, মোক্ষেচ্ছুও নহেন, মুক্তও নহেন; তিনি সদ্রূপ অনির্বাচ্য।

বিক্ষেপেঽপি ন বিক্ষিপ্তঃ সমাধৌ ন সমাধিমান্।
জাড্যেঽপি ন জড়ো ধন্যঃ পাণ্ডিত্যেঽপি ন পণ্ডিতঃ ॥৯৭॥

জ্ঞানীই ধন্য; তিনি বিক্ষেপ সত্ত্বেও বিক্ষিপ্তচিত্ত নহেন, সমাধিসত্ত্বেও সমাধিযুক্ত নহেন, জড়তাসত্ত্বেও জড় নহেন, পাণ্ডিত্য থাকিলেও পণ্ডিত নহেন।৯৭।

মুক্তো যথাস্থিতিস্বস্থঃ কৃতকর্ত্তব্যনির্বৃতঃ।
সমঃ সর্বত্র বৈতৃষ্ণ্যান্ন স্মরত্যকৃতং কৃতম্ ॥৯৮॥

জ্ঞানী মুক্তপুরুষ, যে অবস্থাতেই থাকুন, সুস্থচিত্তে থাকেন্; কৃত বা কর্ত্তব্য-বিষয়ে অহঙ্কার বা উদ্বেগ প্রকাশ করেন না; তিনি সর্বত্র সমভাবযুক্ত এবং বৈতৃষ্ণ্যবশতঃ কৃতাকৃত কিছুই স্মরণ করেন না।৯৮।

ন প্রীয়তে বন্দ্যমানো নিন্দ্যমানো ন কুপ্যতি।
নৈবোদ্বিজতি মরণে জীবনে নাভিনন্দতি ॥৯৯॥

জ্ঞানীর বন্দনা করিলেও তিনি অধিকতর প্রীত হন না, অথবা নিন্দা করিলেও অধিকতর কুপিত হন না; মরণ উপস্থিত দেখিলেও উদ্বিগ্ন হন না, বা জীবন পাইলেও হর্ষোৎফুল্ল হন না; (অর্থাৎ তিনি সর্বদা একরূপ)।

ন ধাবতি জনাকীর্ণং নারণ্যমুপশান্তধীঃ।
যথাতথা যত্র তত্র সম এবাবতিষ্ঠতে ॥১০০॥

উপশান্তবুদ্ধি জ্ঞানী ব্যক্তি জনাকীর্ণ স্থানের জন্যও ধাবন করেন না, বা নির্জন অরণ্যের জন্যও ছোটেন না; তিনি সকল স্থানে ও সকল বিষয়েই একসমানভাব অবলম্বন করিয়া থাকেন্।

ইতি অষ্টাবক্রগীতায় শান্তিশতক-নামক অষ্টাদশ প্রকরণ। (ক্রমশঃ)

শ্রীধীরেশচন্দ্র শাস্ত্রী।

# নিবেদন।

আমার বাসনা যেন হয় না বড়!—
'অহং'এর অভিচারে সাজাইয়া নির্ম্মাল্যেরে
সাধনা করি না যেন শোভাতে দড়;—
চেতনা হয় না যেন জড়েতে জড়!—

শাস্তি দিও এ-পূজায় যদি থাকে ভুল!
রুদ্রত্বের মুখ চেয়ে, দুঃখে ক্ষোভে ক্ষিপ্ত হয়ে
নীচতা-চরণে যদি ঢালি অর্ঘ্য-ফুল,
তখনি বেদনা দিও, হৃদে হানি শূল!

খুঁজিতে কলঙ্ক-মাঝে গৌরবের জয়,
লক্ষ্য করি আপনারে, যদি কাঁদি নিজ তরে,
উপলক্ষ্য রাখি তোমা, চোখে অশ্রু বয়,
তখনি এ আঁখি যেন দৃষ্টিহীন হয়।

দহিও কামনা-রাশি, করি দগ্ধক্ষার
মর্ম্মভেদী জ্বালাদানে, জড়তা নাশিয়া প্রাণে
শক্তি দিও খুঁজিবারে, শান্তি সংস্কার!
ঢেলে দিতে তব পায়ে, সব ব্যথা ভার!

আমার ছলনা মোরে দিও না সহিতে!
ঘুচাইয়ে দুর্ব্বলতা, ঘৃণা-মূঢ়-কপটতা,
ছিন্ন করি আবরণ আপনা ঢাকিতে,—
তোমারে চিনিতে শক্তি ফুটাও আঁখিতে।

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

---

# হিন্দুর তীর্থনিচয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীকৃষ্ণ যে ভগবানের মনুষ্যাবতার, তাহা সর্ব্বশাস্ত্রে উক্ত আছে। যৎকালে শ্রীকৃষ্ণ অবতার হইয়া মনুষ্যবৎ কর্ম্মসাধন করিয়াছিলেন, তৎকাল-জাত মনুষ্যেরা যদি তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতা অবলোকন না করিতেন, তবে কি তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া মান্য করিতেন। যদি বলা যায়, তৎকালে তাঁহাকে সকলে ঈশ্বর বলেন নাই; তাহার প্রমাণ,—শিশুপাল, জরাসন্ধ, দুর্য্যোধন প্রভৃতি রাজারা তাঁহাকে গোপোচ্ছিষ্টভুক্ ও গোপীজার দুরাত্মা বলিয়া অনেক নিন্দা করিয়াছেন। তাহার উত্তর,—ইহা সত্য, কিন্তু যে-সকল শাস্ত্রে এতদ্রূপ উক্তি আছে, সেই সকল শাস্ত্রেই তত্তদ্ব্যক্তির উক্তিতে পুনর্ব্বার তাঁহার ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে। ভারতোক্ত পাণ্ডবগীতায় দুর্য্যোধন শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়াছেন—"জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তি র্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ। ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"; এবং শিশুপালও সভাপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ-নিন্দাকরণানন্তর চক্রাহত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তব করেন এবং মরণানন্তর সর্ব্বলোকের সাক্ষাতে তদ্দেহোত্থিত তেজ উল্কার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ-চরণে লীন হইয়া যায়। ন্যায়ের কুসুমাঞ্জলির প্রথম মঙ্গলাচরণে গৌতমাচার্য্যও গোপবেশ শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত প্রণামসূত্র লিখিয়া-

ছিলেন, "কোঽপি গোপতনয়ো নমস্ততে" ইত্যাদি এবং ন্যায়ের টীকাকারেরও ঐরূপ আদৌ নমস্কার-সূত্র ; যথা—"নূতনজলধর-রুচয়ে গোপবধূটী-দুকূলচৌরায়। তস্মৈ নমঃ কৃষ্ণায় সংসার-মহীরুহস্য বীজায়॥" যদি রতি-কেলি-কলাপেই পারদর্শী বলিয়া কৃষ্ণ উপাস্য হইতেন, তবে রাবণ ও কার্ত্তবীর্য্য প্রভৃতি অনেকানেক রাজা রতি-কেলিতে পরম পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া অবশ্যই লোকের উপাস্য হইতেন। আর যদি স্ত্রী-সঙ্গাদি-ক্রীড়াকলাপে বিরত ব্যক্তিকে ঈশ্বর বলাই নিশ্চয় হয়, তবে কৃষ্ণাবতার-কালে ভীষ্মাদি মহানুভব ব্যক্তি, যাঁহারা তত্তৎকর্ম্মে নিতান্ত বিরত ছিলেন, তাঁহারাই বা ঈশ্বররূপে উপাস্য কেন হইলেন না? বরং ঐ মহানুভবেরা সেই কৃষ্ণের লীলা-কথার আবৃত্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া স্তব করিয়াছিলেন।

যদি বলা যায়, কৃষ্ণ যদি ঈশ্বর হন, তবে কেন তিনি শিবারাধনা করিয়াছিলেন? তাহার উত্তর এই যে, মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ যে শিবারাধনা করিয়াছিলেন, তাহার মীমাংসা কূর্ম্মপুরাণে ২৪ অধ্যায়ে কৃষ্ণ-মার্কণ্ডেয়-সংবাদে উক্ত হইয়াছে। যথা—

"পুত্র-সহিত শ্রীকৃষ্ণকে শিবপূজায় রত দেখিয়া মার্কণ্ডেয় শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে জগদীশ্বর, তুমি সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কারণ পরম-ব্রহ্ম, নির্ম্মল নির্ব্বাণপদ, যোগীদিগের হৃদি চিন্তনীয়, এবং কর্ম্মদ্বারা কর্ম্মিগণের পূজ্য, ভারাবতারণার্থ ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছ! অতএব তোমা-কর্ত্তৃক শুভ-কর্ম্মানুষ্ঠান-দ্বারা কোন্ দেব আরাধনীয় হইয়াছেন, এই সংশয় ছেদ করিয়া কহিতে আজ্ঞা হয়'।" কৃষ্ণ কহিতেছেন, "হে ঋষে, তুমি যে কহিলে আমি ভারাবতারণে অবতার হইয়াছি, ইহা সত্য; তাহাতে সংশয় কি? আমার কোন কর্ম্ম কর্ত্তব্য নাই, অথচ সর্ব্বকর্ম্ম কর্ত্তব্য; আমি ত্রৈলোক্যের সৃষ্টিকর্ত্তা, আমার প্রাপ্ত্যর্থে প্রার্থনা কি? তথাপি মনুষ্যাবতার-প্রযুক্ত মনুষ্যধর্ম্ম দেখাইবার জন্য লোক-শিক্ষার্থ মনুষ্যহিতের নিমিত্ত শিবলিঙ্গ অর্চ্চনা করিতেছি।"

উক্ত পুরাণে ভগবান্ লোক-শিক্ষার্থ গুরুর নিকট মন্ত্রদীক্ষা ও বেদবিদ্যা ও জ্ঞান-শিক্ষা, এবং দেবোপাসনা যাগ-যজ্ঞ-কর্ম্মকাণ্ডাদি সম্পাদন করিয়াছিলেন। যে ঋষিদিগের নিকট তিনি উপদিষ্ট হইয়াছিলেন, সেই সকল ঋষির উক্তিতেই কৃষ্ণের স্বরূপতত্ত্ব সুব্যক্ত হইয়াছে। যথা :—

'ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যৎকালে বিদ্যাশিক্ষার্থ মুনিদিগের আশ্রমে গমন করেন, তৎকালে মুনিগণ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া কহিতেছেন, 'এই শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ পরমেশ্বর, সাক্ষাৎ নারায়ণ, অজ, অব্যয়, পুরাতন পুরুষ, দীপ্ত তেজস্বী, সম্প্রতি আগমন করিতেছেন। ইনিই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের এক কর্ত্তা, ইনিই বেদবেদ্য অমূর্ত্ত পুরুষ, সংপ্রতি মূর্ত্তিমদ্রূপে মুনিগণের দর্শনার্থ এই তপোবনে আগমন করিয়াছেন। ইনিই সর্ব্বনিয়ন্তা; ইহাঁর নিয়ন্তা কেহই নহেন; বিশ্বধারণ-কর্ত্তা সত্যসংকল্প পরমাত্মা স্বীয় ইচ্ছায় অবতীর্ণ হইয়া আত্ম ঐশ্বরভাব লোককে জ্ঞাত করিবার জন্য বিচরণ করিতেছেন।'

আমরা পুরাণের কথা বলিলাম। এখন দেখা যাউক, শ্রুতিতে দেবকীপুত্রকে ঈশ্বর

বলিয়াছেন কি না। নারায়ণ, আত্মবোধ এবং মহোপনিষদাদিতে স্পষ্ট ঐ উক্তি দেখা যায় :—

ওঁ নমো নারায়ণায় শঙ্খচক্রগদাধরং তস্মাদো। নমো নারায়ণায়েতি মন্ত্রোপাসনা-বৈকুণ্ঠং ভগবল্লোকং গমিষ্যতি। অথ যদিদং ব্রহ্মপুরমিদং পুণ্ডরীকং তস্য ব আত্মা হেম-পুণ্ডরীকমধ্যে তস্মাৎ কারণরূপং বিজ্ঞানঘনং তস্মাত্তড়িদাভমাত্রং দীপবৎ প্রকাশো ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুত্রো ব্রহ্মণ্যো মধুসূদনঃ। ইতি শ্রুতিঃ।

শঙ্খচক্রগদাধর নারায়ণের ধ্যান করতঃ, অষ্টাক্ষর মন্ত্রোপাসনাতে বৈকুণ্ঠাখ্য ভগবল্লোক-প্রাপ্তি হয়, যাহাকে বিষ্ণুর পরমপদ বলে। (ইহা ঋগ্বেদের দ্বিতীয়াধ্যায়ে বৈষ্ণবী ঋকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং আধ্যাত্মিকত্বে আত্মহৃৎপ্রদেশে ঐ ভগবান্‌কে ধ্যান করিতে শ্রুতি অনুশাসন করিয়াছেন।) হৃদয়াকাশের নাম পুণ্ডরীক, যাহাকে ব্রহ্মপুর কহে; তাহাতে স্বর্ণবর্ণপদ্মমধ্যে যে জীবাত্মা কারণরূপ বিজ্ঞানঘন অর্থাৎ ঘৃতকাঠিন্যের ন্যায় ঘনীভূত, বিজ্ঞানস্বরূপ তাহাতে বিদ্যুদ্দীপ্তির ন্যায় উদ্দীপ্ত দীপবৎ প্রকাশ, তন্মধ্যে পরব্রহ্ম, সর্ব্ব-বেদবেদ্য দেবকীপুত্র ব্রহ্মণ্যদেব মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ, যিনি স্বপ্রকাশ নিত্যসত্য মুক্তস্বভাব সচ্চিদানন্দ, সর্ব্বদা বিরাজমান আছেন।

যাহা হউক, মোট কথা এই যে, শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে শ্রুতি ও পুরাণ একমত। এক্ষণে দেখা যাউক, তাঁহার রাসলীলা কিরূপ?

মহারাস

বাহিরে বৃন্দাবন, রাসমণ্ডল, ও গোপীগণ, এ সমস্তই অধ্যাত্ম-বিষয়মাত্র। পরমাত্মা মনুষ্য-শরীরে তাবৎ তত্ত্ব রাসলীলা-ব্যপদেশে বাহ্যে বৃন্দাবন-ধামরূপে কল্পনা করিয়া মনুষ্য-মাত্রকে উপদেশ করিয়াছেন যে, তাঁহার স্বরূপ-তত্ত্ব উপলব্ধি করা জীবের সাধ্য নহে; তাঁহার এই মাধুর্য্যলীলা-শ্রবণে জীব কৃতার্থ হইবে। এই অভিপ্রায়ে তিনি স্বীয়া ইচ্ছাশক্তি রাধিকার প্রতি ঈক্ষণ করিলেন। সেই পরাশক্তি রাধিকাই সকল করেন, ভ্রান্ত লোকে চিন্ময় নিরঞ্জন নির্ব্বিকার নিরীহ শ্রীকৃষ্ণেতে তাহার আরোপ করিয়া কহে, যে শ্রীকৃষ্ণই সকল লীলা করিতেছেন। ফলে, শ্রীকৃষ্ণ কিছুই করেন নাই; তিনি নির্লিপ্ত, অতিস্বচ্ছ, নির্ম্মল; গোপীদিগের রাগে অনুরাগী হন এই মাত্র; যেমন স্বচ্ছস্ফটিক-সন্নিধানে রক্তবর্ণ কোন বস্তু থাকিলে তাহার রক্তাভাতে তৎকালে অতিশুদ্ধ স্ফটিককেও রক্তবর্ণ বোধ হয়। রাসেও "যোগমায়া-মুপাশ্রিত" কহিয়াছেন, অর্থাৎ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ যোগ-মায়াতে সমাশ্রিত হইয়া রাস করিয়াছেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের কৃতিত্ব নাই, কেবল যোগ-মায়াই প্রবলা; যেহেতু (উপ উপসর্গার্থে অধিক), আত্মাকে অধিকৃত করিয়া যোগমায়া-বিলসিত-রাসাদি-লীলা প্রকাশিতা হয়। যেমন নটদিগের রঙ্গভূমিতে খেলকীযারা অস্বরূপে স্বরূপবৎ দৃষ্টি হয়, তদ্রূপ রাস-স্থলে মহানটী যোগমায়া রঙ্গভূমি সাজাইয়া নিজ-কৃত লীলাকার্য্য-সকল শ্রীকৃষ্ণ করিলেন, ইহাই সর্ব্বলোকে জানাইয়াছিলেন। ঐ যোগমায়া রাধিকা ও পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ, জীবশরীরে শিরোবস্থিত সহস্রদল পদ্ম যাহাই গোলো-কাখ্য মহদ্ধাম, তাহাতে নিত্য রাস করিতে-ছেন। সমস্ত পৌর্ণমাসীতে রাস হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মার রাত্রি-পরিমাণ প্রলয় পর্য্যন্ত, যাবৎ

প্রলয় না হয় তাবৎ, রাস হইতেছে। ইহাতে কোটী কোটি ব্রহ্মরাত্রি-পরিমাণ প্রলয় পর্য্যন্ত, যাবৎ প্রলয় না হয় তাবৎ, রাস হইতেছে। ইহাকে কোটী কোটী ব্রহ্মরাত্রি বলাতে "ভগবান্ পিতারাত্রী" বলিয়া ভাগবতে লেখেন। বহু-প্রলয়কাল পর্য্যন্ত রাস হয়, এক এক জীবের কলেবর-ত্যাগকাল প্রলয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সুতরাং, রাসেরও নিত্যতা থাকিল। * * * অতএব শৃঙ্গারাদি-ক্রিয়া লইয়া যে রাসলীলা বর্ণন করা করা হয়, তাহা নহে।

নির্গুণ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণে যে গুণবৎ ক্রিয়া দেখা যায়, তাহা মিথ্যা। শ্রীকৃষ্ণ কিছুই করেন না, প্রকৃতিই সকল করেন। বেদান্ত বলেন, "ঈক্ষিতে র্না শব্দঃ।—" তাঁহার ঈক্ষণে প্রকৃতিই সকল কার্য্য করিয়া থাকেন। অধ্যাত্ম চিন্তকেরা প্রকৃতিই সর্ব্বকার্য্যকর্ত্রী ইহা জ্ঞানদৃষ্টিতে অবলোকন করেন এবং প্রকৃতিই সর্ব্বজীবের বন্ধন-মোচনীও হয়েন। এ-কারণ পরমা প্রকৃতি যেমন জীবনিকায়কে সংসার-বন্ধে বন্ধন করিয়াছেন, তেমনই সংসারবন্ধন হইতে জীবকে মুক্ত করিবার কারণ। যাহে অধ্যাত্মতত্ত্বকে মূর্ত্তিমান করিয়া জীব-সকলকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে; অর্থাৎ পরমাত্মাকে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণরূপে সাজাইয়া রাসবিলাসাদি নানা লীলা প্রকাশ করেন, সেই সকল লীলা-কথার শ্রবণ-মননে জীবের পরমাগতিলাভ হইয়া থাকে। এজন্য পুরাণাদি শ্রীবৃন্দাবনকে গোলোকের ছায়া বলেন, অর্থাৎ শিরঃস্থিতাধোমুখ সহস্রদল-কমলাখ্য গোলোকমণ্ডল, তৎপ্রতিবিম্বস্বরূপ এই বৃন্দান। যথা—

সহস্রপত্রকমলং ধ্যেয়ং মাথুরমণ্ডলম্। ইতি।

পদ্মপুরাণম্।

পত্রকমলাকার এই বৃন্দাবন মাথুরমণ্ডল নামে খ্যাত। যদ্রূপ শিরঃসহস্র পত্রের দল-সকল অধোমুখ, তদ্রূপ বৃন্দাবনস্থ তরুগণেরও অধোমুখী শাখা। যথা, "বৃন্দাবনস্থাস্তরবঃ সর্ব্বে চাধোমুখাঃ স্মৃতাঃ।" যেমন শিরঃ-স্থিতাধোমুখ কমলাভ্যন্তরে গুরুরূপী পরমাত্মার মুখ্যাবস্থান দ্বাদশদল পদ্মান্তরে, তদ্রূপ বৃন্দাবন-মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণাসন দ্বাদশ বন আছে।

ব্রহ্মরন্ধ্রসরসীরুহোদরে নিত্যলগ্নমবদাতমদ্ভুতং
কুণ্ডলীবিবরকাণ্ডমণ্ডিতং দ্বাদশার্ণ-
সরসীরুহং ভজে। যামলং।

ব্রহ্মরন্ধ্র সহস্রদল-কমলোদরে নিত্যলগ্ন পরম বিষদবর্ণ অত্যদ্ভুত-শোভাবিশিষ্ট, কুণ্ডলীশক্তি তাহার বিবরকাণ্ড অর্থাৎ বোঁটা; সেই দ্বাদশদল পদ্মে আত্মার নিত্যাধিষ্ঠান। বৃন্দাবনেও সহস্রবনমধ্যে দ্বাদশবন আছে; তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যাধিষ্ঠান। যথা :—

দ্বাদশৈববনীসংখ্যা কালিন্দ্যাঃ সপ্ত পশ্চিমে।
পূর্ব্বেপঞ্চবনং প্রোক্তং তত্রাস্তি গুহ্যমুত্তমম্॥ইতি
অন্তক্যোপবনং প্রোক্তং কৃষ্ণক্রীড়ারসস্থলং॥

পাদ্মে

যমুনার পশ্চিমে সপ্ত, পূর্ব্বে পঞ্চবন—এই দ্বাদশটী প্রধান বন। অতিগোপনীয় পুরুষোত্তম-তত্ত্ব তাহাতে নিহিত আছে অর্থাৎ অতিগূঢ়-তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণাখ্য আত্মার নিত্যাধিষ্ঠান তাহাতে আছে। অন্যান্য যে সকল উপবন, তাহাও শ্রীকৃষ্ণ-ক্রীড়ারসের স্থান। পৌর্ণমাসী দেবী সেই বৃন্দাবনাখ্য পদ্মের মূলকাণ্ড। যদ্রূপ শিরঃস্থিতাখ্য বিরজা

শংখিনী নাড়ী অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি অকথাদি ত্রিরেখারূপে সহস্রার-মধ্যে আছে, তদ্রূপ বৃন্দাবনে যমুনাও অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

---

# পরলোকগতা কৃষ্ণভাবিনীর স্মৃতি। *

আজ আমরা যাঁহার কথা বলিতে এখানে আসিয়াছি, তিনি দেশনায়ক, বীর অথবা ধনসম্পদে মহিমান্বিত ব্যক্তি নহেন্। তিনি এই দুঃখিনী বঙ্গজননীর একটি কন্যামাত্র। তাঁহার নাম কৃষ্ণভাবিনী দাস। তিনি জমিদার-কন্যা এবং লক্ষপতি পরলোকগত উকিল শ্রীনাথ দাসের পুত্রবধূ; সুশিক্ষিত ও স্বাধীন-চিত্ত ৺ দেবেন্দ্রনাথ দাসের সহধর্ম্মিণী। দেবেন্দ্রনাথ ইংলণ্ডে আট নয় বৎসর জ্ঞানা-লোচনায় অতিবাহিত করিয়া সস্ত্রীক দেশে ফিরিয়া আইসেন। এখানে আসিয়া তিনি "সেঞ্চুরী কলেজ" স্থাপন করিয়াছিলেন! কৃষ্ণভাবিনী স্বামীর প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর ন্যায় তাঁহার শিক্ষাদান-কার্য্যে সহায়তা করিতে আরম্ভ করেন্।

ভারতনারী জ্ঞান, ধর্ম্ম ও উচ্চ শিক্ষা লাভ করিলে, সীতার ন্যায় তেজোদৃপ্তা, গার্গীর ন্যায় ব্রহ্মবাদিনী, মৈত্রেয়ীর ন্যায় কামনাশূন্যা হইয়া, জগৎহিতের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়া কেমন পরিপূর্ণ হয়, কৃষ্ণভাবিনী তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন্।

এই শিক্ষিতা, মানসিক- ও আধ্যাত্মিক-উন্নতি-সম্পন্না মহীয়সী মহিলার আত্মবিলোপ-কারী সেবা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা বিস্ময়ে পুলকিত হইয়াছেন। তিনি স্বামী ও একমাত্র কন্যার পরলোক-গমনের পর শোকের আগুনে পুড়িয়া খাঁটি মানুষ হইয়া-ছিলেন। জ্ঞান-ধর্ম্মের সংযোগে তাঁহার প্রাণের নিম্নস্তর হইতে পবিত্র মাতৃমূর্ত্তি দীপ্তি-ময় হইয়া উঠিয়াছিল। স্বামি-প্রেমে আত্মোৎ-সর্গকারী তপঃপ্রভাবে তিনি ভগবৎপ্রেমে পূর্ণ হইয়াছিলেন। একমাত্র-কন্যা-বিয়োগ-শোকে ভাষাহীন নিঃস্বার্থ অপত্যস্নেহে পরিপূরিত হইয়া তিনি দেশের অনাথ আতুর, অসহায়া বিধবা, রুগ্ন ও দুস্থের সেবায় আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছিলেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সুন্দর সামঞ্জস্যময়ী কল্যাণীয়-মূর্ত্তি আমরা তাঁহাতে দেখিতে পাইতেছি। পাশ্চাত্ত্যের কর্ম্মশীলতা ও স্বাধীনতা-প্রিয়তা এবং প্রাচ্যের ভক্তিপূর্ণতা, বিনয় প্রভৃতি ভূষণ তাঁহার হৃদয় সমুজ্জ্বল করিয়াছিল। তিনি আমাদের দেশের এই অবরোধ বাসিনী বঙ্গমহিলা হইয়াও তেজোদৃপ্তা ছিলেন্। কর্ম্মনির্ব্বাহের জন্য এই জনতাপূর্ণ সহরের রাজপথে লজ্জা ও শালীনতার সহিত পদব্রজে তিনি বীরাঙ্গনার ন্যায় চলিয়া যাইতেন।

---

* ভারত-মহিলা-সমিতি হইতে তাঁহার স্মৃতিসভায় পঠিত।

তাঁহার তেজঃপূর্ণ-মূর্ত্তি দেখিয়া লোকে সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিত।

পতি ও সন্তানকে হারাইয়া আমাদের দেশের শত শত নারী অকূলে ভাসিয়া যান্ অথবা কোনমতে জীবন ধারণ করেন। শত শত নারী স্রোতের ফুলের ন্যায় সংসারে কেবল তরঙ্গাঘাতই সহ্য করেন। কত নারীজীবন অজ্ঞানান্ধকারে আপনার আপনার আত্মার প্রকৃত শক্তিকে প্রকাশ করিতে না পারিয়া কত কষ্টেই আমরণ কাল কাটায়। কিন্তু উচ্চ শিক্ষা ও দীক্ষার গুণে কৃষ্ণভাবিনীর আত্মশক্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। স্বামী ও সন্তানকে হারাইয়া সংসারে তিনি মৃতপ্রায়া হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আত্মা শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। সেই আত্মবলে বলীয়সী হইয়া তিনি দেশের কল্যাণকর কার্য্যে আপনাকে বলিদান দিয়া অনাথা, বিধবা ও পতিতাদের সেবায় আপনাকে অর্পণ করিয়াছিলে; এই ধনৈশ্বর্য্যশালিনী ভোগ-বিলাসময়ী নগরীর সহস্র সহস্র নারীর মূর্খতা দূর করিবার জন্য তিনি আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণভাবিনী এই কলিকাতা-সহরের ধনী, নির্ধন, সকল গৃহেই মায়ের স্নেহ লইয়া অবাধে বিচরণ করিয়া অবরোধ-বাসিনী অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্না নারী-দিগের শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া-ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় কত অবরোধ-বাসিনী মহিলা জ্ঞানের আলোকে আত্ম-প্রসাদ পাইয়া জীবনকে কৃতার্থ করিতে পারিয়াছেন্। যদিও তাঁহারা অবরোধে আবদ্ধ, কিন্তু তবুও আজিকার এই পবিত্র স্মৃতিসভা-রূপ তর্পণ-ক্ষেত্রে স্বর্গীয়া মহিলার প্রতি তাঁহাদের কৃতজ্ঞতা বায়ু বহন করিয়া আনিতেছে।

কৃষ্ণভাবিনী অন্তঃপুর-বাসিনী রমণীদিগের শিক্ষার দ্বার এরূপে উন্মুক্ত করিয়াছিলেন, যাহা এদেশের নারীহিতৈষী পুরুষগণও করিতে পারেন্ নাই। পাড়ায় পাড়ায় স্ত্রীশিক্ষা-প্রচলনের জন্য বিদ্যালয়-স্থাপন করা ও অন্তঃপুর-স্ত্রী-শিক্ষা-প্রচলন করা তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল। বালিকাবিদ্যালয়, বিধবাশ্রম ও পতিতাশ্রম-স্থাপন তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য। পতিতারাও যাহাতে শিক্ষা ও ধর্ম্মে কর্ম্মে অগ্রসর হইয়া জীবনটাকে ধরিয়া দাঁড়াইতে পারে, সে-জন্য তিনি আশ্রম করিয়া ছিলেন। তাঁহার কাছে যে-কোনও দুঃখিনী অনাথা আসিয়াছে, কাহাকেও তিনি ফিরাইতে পারেন নাই। কত বড় হৃদয় হইলে সংসারে এত প্রেম ও স্নেহ বিলাইতে পারা যায়, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়! এই সকল পুণ্যকার্য্যের জন্য সরকারী সাহায্য কখনও তিনি গ্রহণ করেন্ নাই। তিনি নিজ-অর্থদ্বারা কত সৎকার্য্য করিতেন্, কেহ তাহা জানে না। 'দক্ষিণ হস্ত দান করিবে, বাম হস্ত জানিবে না।'—এই পুণ্যশীলা রমণীতে আমরা তাহাই দেখিয়াছি। শুধু কি বিধবা-অনাথারাই তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া-ছেন? না, কুমারীরাও তাঁহার আদর্শজীবনে জীবন গঠন করিবার জন্য আশা পাইয়াছে। তিনি নারীজাতির সম্মুখে নূতন আদর্শ ধরিয়া ছিলেন। নারীকে আপনার বিশাল ভগবৎ-প্রেমযুক্ত মাতৃহৃদয় লইয়া নিজের গণ্ডীর মধ্যে থাকিলে চলিবে না; অন্যের সুখে দুঃখে নিজেকে মিলাইতে না পারিলে নারীর জীবন বৃথা।

কৃষ্ণভাবিনীর হৃদয় ভগবৎভক্তিতে পরিপূর্ণ ছিল। আমরা তাঁহার বাটীতে যাইয়া দেখিয়াছি যে, ছাদের উপর তিনি অতি ছোট কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। প্রশ্ন হইল, এইটুকু ঘরে কি হয়?—তিনি লজ্জাবিনম্রচিত্তে বলিলেন, "এটি আমার উপাসনা-গৃহ।" এই কথা বলিয়া নববধূর মত তাঁহার মুখ আরক্তিম হইল। অবাক্ হইলাম,—এ কোন্ প্রেম!—এ যে স্বামীর স্বামী পরম-স্বামীর প্রেম! প্রকৃত ব্রহ্মপ্রেমে কি অবর্ণনীয় জ্যোতিঃ হয়, তাহা সেই সাধ্বী ভগবৎ-প্রেমিকা কৃষ্ণভাবিনীর মুখে সে-দিন যাহা দেখিয়াছি, তাহা কখনও ভুলিতে পারিব না।

তবে বঙ্গের সমস্ত নারী, স্বর্গীয় মহিলা যে কাজ করিতে করিতে বিশ্বপতির আদেশে তাহা অসম্পূর্ণ রাখিয়া চলিয়া গিয়াছেন,—নারীজগতের নবযুগের মুক্তপথনির্দ্দেশ করিয়া-গিয়াছেন, সেই কার্য্য উদ্‌যাপনে তোমরাও ব্রতী হও। মন দিয়া, চিন্তা দিয়া, অর্থ দিয়া, সেবা দিয়া, সমস্ত নারী-জাতি কি একটি নারীর অভাব মিটাইতে পারিবেন্ না? বঙ্গমাতা ভগবৎপ্রেমিকা জনপদকল্যাণ-কারিণীর প্রতীক্ষা করিতেছেন। এই দিব্য আত্মা-দিব্যধামবাসিনীর তর্পণ অদ্য শেষ করি। জগদীশ্বর নারীজাতিকে বল দিন্।

## তর্পণ-কবিতা।

—এই অন্ধ বঙ্গভূমে কে তুমি গো দেবী
এসেছিলে নামি?
শিক্ষার প্রকৃত মান তুমি দেখাইলে
জগৎ নিখিলে!
বিশ্বপ্রেমে, ভক্তি-স্নেহে, জ্ঞানে গরীয়সী
ওগো মহীয়সী,
অনাথ আতুর তারা, বিশ্বজন-হেয়
পায় তব স্নেহ!
বঙ্গনারী শিক্ষা-বিনা জগতে যে দীনা,
ছিল তব জানা;
নারী-আত্মা কত উচ্চ কত গরীয়ান্,
হেথা নাই জ্ঞান!
পিঞ্জরে পালিতা সে যে অতিতুচ্ছ হীনা,
দেশ করে ঘৃণা।
সতীত্বে বিজয়ী সে, যে বিলাসে সংযমী
—জানে না এ ভূমি!
গৃহকোণে রাখে তারে পশুপক্ষী মত,
ভাবে না মহত্ব!
তুমি দেবী জ্ঞানালোক পুণ্য-হস্তে ধরি
বিতরিলে মরি,
মুক্তির মঙ্গলবার্ত্তা দিলে ঘরে ঘরে
এ নারী-জাতিরে!
অভাগা-অনাথা-মুখে ফুটাইলে হাসি,
তাপিতে সম্ভাসি'।—
নিদারুণ ভুল-ক্রমে কে আছ পতিত,
আহা হা ব্যথিত!
স্নেহকোলে লয়ে অশ্রু মুছাইয়া দাও,
আদর্শে ফিরাও।
ঈশ্বর-বিশ্বাসহীনা কে আছ তনয়া
শান্তি না পাইয়া,
শোকে দুঃখে, পাপে তাপে, নিরাশায় প্রাণ
বিষাদে যে ম্লান;
ভগবৎ-প্রেম ঢালি স্নিগ্ধ করে দিয়া
জুড়াইছ হিয়া;
গোপনে পত্রান্তরাল ফুলের মতন
ছিলে সংগোপন!
শিক্ষার অমৃত-ভাণ্ড নিয়ে তুমি করে
ভ্রম দ্বারে দ্বারে!
আজ তুমি দিব্যলোকে, বঙ্গ-মাতা-হিয়া
উঠে যে কাঁদিয়া!
বঙ্গনারী, নবব্রত লও আজি তুলে,
সে যে গেছে চলে!

শ্রীলীলাবতী মিত্র।

# অভ্যাসের বিধি।

প্রত্যেক সন্তানের মাতাপিতা, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী বা অন্য যে-সকল ব্যক্তির হস্তে সন্তানগণের লালন-পালন ও শিক্ষার ভার ন্যস্ত থাকে, তাঁহারা কি গুরুতর দায়িত্ব-ভার মস্তকে গ্রহণ করিয়া এই ধরাক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছেন, তাহার বিষয় একবার চিন্তা করিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। এইরূপ গুরুতর দায়িত্বের পিঞ্জরে আবদ্ধ হইয়া নরনারী যে কিরূপে সুখে অবলীলাক্রমে স্বৈরাচারে সময়াতিপাত করে, তাহা ভাবিয়া কূল পাওয়া যায় না। আংশিকরূপে মাতাপিতার সদসদ্-গুণের অধিকারী হইয়া সুখদুঃখানুভূতি ও লেশমাত্র শক্তি লইয়া যে শিশুটী জন্মগ্রহণ করে, উহা কে? এই আনন্দ-প্রতিমূর্ত্তি—উহাই কি ভবিষ্যতের ঐ অত্যাচারী দানবপ্রকৃতি মাতাপিতৃবয়স্ক পাষণ্ড সন্তান নহে? উহাই কি ঐ বিষয়াসক্ত সংসারকীট নহে? অথবা উহাই কি ঐ উদারপ্রকৃতি ধীমান্ সাত্বিক-স্বভাব তত্ত্বদর্শী পণ্ডিত নহে? আমরা কি জগতের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় এরূপ দৃষ্টান্ত দেখিতেছি না যে, জনকজননী যে সন্তানকে শতস্নেহের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া পালন করিয়াছেন, তাহারই জন্য দেবতার শ্রীচরণে স্বীয় বক্ষঃশোণিতধারা চন্দনের ন্যায় অনুলেপন করিয়াছেন, বয়ঃপ্রাপ্ত সেই সন্তানই মাতাপিতার শত আহ্বানে বধির হইয়া কুপথে ধাবিত হইয়াছে ও হইতেছে, আপনার বিনাশসাধনে উদ্যত হইতেছে! আবার কেহ বা মাতাপিতা প্রভৃতির ঋণতার উপলব্ধি করিয়া কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে অবনত-মস্তকে জনকজননীর চরণ-সেবাতেই আত্মোৎসর্গ করিতেছে! কেহ বা সংসারপ্রিয় জনকজননীর শত স্নেহবন্ধন ছিন্ন ভিন্ন করিয়া কাহার আহ্বানে কোথায় চলিয়া যাইতেছে! এইরূপ বৈচিত্র্যের কারণ কি? ঐ সকল ব্যক্তির কার্য্যকলাপ ও মনের মধ্যে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে-ব্যক্তি যেরূপ অভ্যাসের বশবর্ত্তী হইয়াছে, যেরূপ চিন্তার স্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দিয়াছে, যেরূপ কর্ম্মক্ষেত্রে আপনাকে অবতীর্ণ করাইয়াছে, সে ভবিষ্যতে সেইরূপই হইয়া গিয়াছে। বহুযুগ পূর্ব্বে উপনিষদেও উক্ত হইয়াছে—"যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি। সাধুকারী সাধুর্ভবতি। পাপকারী পাপো ভবতি। পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন।" অর্থাৎ যে যেরূপ কর্ম্ম করে সে সেইরূপই হয়, সাধুকর্ম্মানুষ্ঠাতা সাধু হয়, পাপকারী পাপী হয়। ইত্যাদি। অপরাপর শক্তিনিচয়ের সহিত মিলিত হইয়া অভ্যাসই তাহাদিগকে সেই সেই ব্যক্তিত্ব প্রদান করিয়াছে। সুতরাং, সকলের পক্ষেই অভ্যাসের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করা অবশ্যকর্ত্তব্য।

যদিও আমরা বাস্তবিকই সদভ্যাস বা কদভ্যাসের কথা বলিয়া থাকি, কিন্তু তাহা হইলেও, অধিকাংশ স্থলেই 'অভ্যাস' এই শব্দের উল্লেখ-দ্বারা কদভ্যাসের কথাই মনে হয়। কোনও ব্যক্তি কর্ম্মসম্পাদন-কালে অযথা বাক্যব্যয় না করিয়া থাকিতে পারে না, কেহ অহর্নিশ তাম্রকূট-সেবন ব্যতীত সুখানুভব করে না, কেহ তাহার প্রত্যেক বাক্যে শপথ

না করিয়া থাকিতে পারে না, কেহ বা প্রত্যেক উক্তিতে মিথ্যার আশ্রয় হইতে চ্যুত হইতে কুণ্ঠা বোধ করে। আমরা যখন এই সকল ব্যক্তির বিষয় আলোচনা করি, তখন বলি, 'উহা তাহার অভ্যাস। ইহা কু-অভ্যাসের সম্বন্ধেই বলা হয়। কিন্তু কোনও ব্যক্তি মৃত্যুর দ্বারে উপনীত হইয়াও যখন সত্য ভিন্ন মিথ্যার আশ্রয় লইতে চাহে না, শত উত্তেজনার মধ্যেও কাহারও সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হয় না, আপামর সকলের সহিতই বিবেচনা-পূর্ব্বক বিনীতভাবে বাক্যালাপ করে, তখন ত আমরা বলি না—'উহা তাহার অভ্যাস'। আমরা ধূমপানের অভ্যাস, শপথ করিবার অভ্যাস, চৌর্য্যের অভ্যাস, মিথ্যাবাক্যপ্রয়োগের অভ্যাস, সুরাপানের অভ্যাস প্রভৃতিকেই 'অভ্যাস'-শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। কিন্তু বৈরাগ্যের অভ্যাস, মিতাচারের অভ্যাস, সংযমের অভ্যাস, সত্যকথনের অভ্যাস, বীর্য্যের অভ্যাস প্রভৃতিকে অভ্যাস শব্দ-দ্বারা নির্দ্দেশ করিতে চাহি না। কিন্তু বস্তুতঃ, আমাদিগের দুষ্টাচার বা ব্যভিচারের ন্যায় আমাদিগের সদাচার বা সদ্গুণা[illegible] অভ্যাস-মাত্র। আমাদিগের জীবনকে [illegible]কৃতিসম্পন্ন—মূর্ত্তিবিশিষ্ট—করিয়া দেখিতে হইলে, দেখা যায়, আমাদের সমুদায় জীবন কেবল অভ্যাসের সমষ্টিমাত্র—আমাদিগের সুখ বা দুঃখের অঙ্ক যথারীতি বিন্যস্ত, কেবল বাহ্য ভাবপ্রধান বা মানসিক অভ্যাসের সমষ্টিমাত্র। এই অভ্যাস-সমষ্টি আমাদিগকে অপ্রতিহতভাবে আমাদিগের সেই অজ্ঞাতপূর্ব্ব ভবিতব্যতা বা অদৃষ্টের দিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিয়াছে।

যেহেতু বালকবালিকাগণ অপেক্ষাকৃত অল্প-বয়ঃক্রমেই এই অভ্যাসের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ, এবং যেহেতু এই উপলব্ধি তাহাদিগের দায়িত্বজ্ঞান-বর্দ্ধনে যথেষ্ট সহায়তা করে, সুতরাং অভিভাবক, শিক্ষক বা জনকজননীগণ যদি তাহাদিগের নিকট অভ্যাসের সরল দার্শনিকতত্ত্ব কিঞ্চিৎ বুঝাইয়া দেন, তাহা হইলে তাহাতে যে নিশ্চয়ই সুফল প্রসব করে, তাহা নিঃসন্দেহ।

আমরা, বোধ হয়, শরীরধারী জীব বলিয়াই, অভ্যাস-নিয়মের বশবর্ত্তী। মৃত্তিকার কোমলতা-, নমনীয়তা-, আকারপ্রদায়িত্ব-হেতু তদ্দ্বারা কুম্ভকার যেরূপ বহুবিধ ঘট-কলসাদি নির্ম্মাণ করিতে পারে, তদ্রূপ সংক্ষেপতঃ আমাদিগের সমগ্র স্নায়ুমণ্ডলীর জৈবিক পদার্থের নমনীয়ত্ব-হেতু আমরা সর্ব্ব-প্রথমে একটী কার্য্য বহু বা অল্প ক্লেশের সহিত সম্পাদন করিলেও অচিরাৎ তাহা অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে বা সহজেই সম্পাদিত করিতে পারি এবং অবশেষে যখন তাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে অভ্যস্ত হইয়া যাওয়া যায়, তখন তাহা আমাদিগের দ্বারা অর্দ্ধ যন্ত্র-চালিতের ন্যায় অবুদ্ধিপূর্ব্বক সম্পাদিত হইয়া থাকে। এতদ্বিষয়ে দুই একটী উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে। শিশুটী যখন প্রথম চলিতে শিক্ষা করে, তাহার কত ক্লেশ, কত যত্ন, কত মনোনিবেশ! সে কতবার উঠে কতবার পড়ে! হয় ত, তাহার অগ্রজ, অগ্রজা বা মাতাপিতা উভয়ে তাহার দুইহস্ত ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে একটী পদের পর আর একটী পদ অগ্রসর করাইয়া তাহাকে চলিতে শিখাইতে-ছেন। কিন্তু এই ক্লেশ বা আয়াস ক্রমেই

দূরীভূত হইয়া যায় এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে "চল" এই আদেশ শ্রবণমাত্রই সে কিরূপে পদের পর পদ অগ্রসর করিয়া চলিতে হইবে, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তা না করিয়াই অগ্রসর হয়। আমরা যখন চলি, তখন কি আমরা চলন-বিষয়ে কোনওরূপ মনোযোগ প্রদান করি? না, অন্যমনস্ক ও কোনও ক্লেশস্বীকার না-করিয়াই যন্ত্রের ন্যায় চলিয়া যাই? আজ এই লেখনী-পরিচালনাকালে একটীবারও ত ভাবিতেছি না—'ক' অক্ষরটী কিরূপ, 'খ' অক্ষরটী কিরূপ? কিন্তু যেরূপ চিন্তার পর চিন্তা আসিতেছে, তাহাই অমনি যন্ত্রের ন্যায় লেখনী-দ্বারা লিপিবদ্ধ হইতেছে; এই কার্য্যে বিন্দুমাত্রও চিন্তা নাই বলিলেও চলে। কিন্তু এইক্ষণে যদি কোনও অজ্ঞাত ভাষায়—তিব্বতীয় বা মালবীয় ভাষায়, তদ্দেশীয় অক্ষর-পংক্তিতে আমার ভাবরাশি লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাই, তাহা হইলে একদিন প্রথম বাঙ্গালা-ভাষা শিক্ষা-কালে যেরূপ ক্লেশস্বীকার করিতে হইয়াছিল, সেইরূপ বা তদপেক্ষা অধিক বা অল্প ক্লেশ স্বীকার করিতেই হইবে। সুতরাং, আমাদিগের স্নায়বিক প্রকৃতির নমনীয়তাই যে আমাদিগের অভ্যাসগঠনে সহায়তা করে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি? কেবল কি বাহ্য শারীর ক্রিয়াতেই এই নিয়ম? তাহা নহে। মানসিক চিন্তা প্রভৃতিতেও ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। যে বিষয়ে মানব যেরূপ অভিনিবেশ-সহকারে চিন্তা করে, তদ্বিষয় তাহার পক্ষে সেইরূপই সহজ হইয়া যায়। যে-ব্যক্তি বাল্যকাল হইতেই জ্যামিতির বিষয় শিক্ষা করিয়াছে, কতশত দিন তাহারই পশ্চাতে ব্যয়িত করিয়াছে, তাহার পক্ষে উহার চিন্তা কিংবা উহার কোনও তথ্য-মীমাংসা দুষ্কর বলিয়া মনে না হইতে পারে, কিন্তু একটী গৃহিণী, যিনি কোনও দিবস তদ্বিষয়ে কোনও চিন্তা করেন নাই, তাঁহার পক্ষে তাহা অতীব দুরূহ বলিয়া প্রতীত হইতে পারে। যে-ব্যক্তি দিনের পর দিন গভীর ঈশ্বর-চিন্তনে কাটাইয়াছে, তাহার পক্ষে ঈশ্বরচিন্তা, জটিল ঈশ্বরতত্ত্ব অতিশয় রম্য বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ঐ অবিমৃষ্যকারী নীতিবিগর্হিত-কর্ম্মানুষ্ঠাতা তাহার অণুমাত্রও উপলব্ধি করিতে সমর্থ নহে। যে ব্যক্তি কোনও দিন 'স পশ্যত্যচক্ষুঃ শৃণোত্যকর্ণঃ, তদেজতি তন্নৈজতি' ইত্যাদি বাক্যের গভীরতা অনুসন্ধান করে নাই, তাহার পক্ষে 'ঈশ্বরের চক্ষু না থাকিলেও দেখিতে পান্, কর্ণ না থাকিলেও শুনিতে পান; তিনি চলেন আবার চলেনও না', ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা সুকঠিন। কিন্তু তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতের নিকট তাহা স্ফুটতর। একবার কোনও ব্যক্তি ঈশ্বর-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা শ্রবণ করিয়াছিলেন যে, 'ঈশ্বর সকলই দেখিতে পান্, সকলই শ্রবণ করেন, গুপ্ত পরামর্শও তাঁহার কর্ণকে অতিক্রম করিতে পারে না; তিনি সাধুহৃদয়ে আপনার বাণী বলেন, আমরা যেখানেই যাই না কেন, তিনি আমাদের সঙ্গেই যান্, সর্ব্বত্র তাঁহার মঙ্গলহস্ত সুদৃশ্যমান ইত্যাদি!' ইহা শ্রবণ করিয়া তিনি অপর এক ব্যক্তির নিকট বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন—'ইহা কিরূপ! এ ঈশ্বরের ধারণা করিতে আমি অসমর্থ! ইহা বড়ই আশ্চর্য্য! ইত্যাদি।' যাহা হউক্, এক্ষণে যাহা বলিতেছিলাম, তাহাই বলি। উপরিউক্ত

দৃষ্টান্ত-সকল হইতে দেখা যায় যে, অভ্যাসই মনুষ্যগঠন করে। মানুষ যেরূপ অভ্যাস করে, পরবর্ত্তী কালে সে সেই অভ্যাসেরই বশবর্ত্তী হয়। মহামতি কার্পেন্টার বলিয়াছেন, যেমন একখানি কাগজ পাট করিলে, তাহা সেই চিহ্নিত ভাঁজে ভাঁজেই চিরকাল পড়িতে চায়, সেইরূপ আমাদিগের স্নায়ুগুলীকে যেরূপ-ভাবে ব্যবহৃত করা যায়, উহা তাহাতেই অভ্যস্ত হইয়া যায়। দারুণ শীত ঋতুর প্রাতঃকালে ঐ যে বর্ষীয়সী মহিলাটী বা বৃদ্ধটী কম্পিতকলেবরে পদব্রজে ক্রোশাধিক পথ অতিক্রম করিয়া গঙ্গাসলিলে স্বীয় ঘটীটী পূর্ণ করিয়া স্নানান্তে আর্দ্রবসনে 'হরি-নাম' করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, উঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে দেখা যাইবে, যে বহু যুবক-যুবতী ঐ কার্য্য অতীব ক্লেশকর বিবেচনা করিলেও,—তাহাদিগের পক্ষে উহা অসম্ভব হইলেও,—ঐ বৃদ্ধা বা বৃদ্ধের পক্ষে ঐ কার্য্য অতিশয় স্বাভাবিক ও আনন্দজনক। বৎসরের পর বৎসর প্রাত্যহিক ঐরূপ স্নানে তাঁহারা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছেন; উহাতে কোনও ক্লেশ নাই, বরং তাহার বৈপরীত্যেই তাঁহাদিগের অস্বস্তি।

এইরূপে দেখা যায়, অভ্যাস মানব-জীবনের উপর কি প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করে!—ইহাই পরে মানবের স্বভাবে পরিণত হয়, তাহার প্রকৃতিগত হইয়া যায়। এই জন্যই ইংরাজিতে উক্ত হইয়াছে—Habit is second nature—অভ্যাস দ্বিতীয় স্বভাব। Duke of Wellingtonএর মতে প্রৌঢ়-জীবনে ইহার গুরুত্ব-অনুসারে ইহাকে স্বভাবের অন্ততঃ ১০গুণ বলা যাইতে পারে। ১০গুণ কেন, তদপেক্ষা বহুগুণে অধিক বলিলেও, বোধ হয়, অত্যুক্তি হইত না। কারণ, ঐ সময়ে অর্জ্জিত অভ্যাসসমূহ, সমসাময়িক পূর্ব্ব হইতে বিরাজমান প্রায় হৃদয়ের সকল ভাব বা অভ্যাস-প্রবণতাকেই নিরুদ্ধ বা বিনষ্ট করে। আমাদিগের কার্য্যের শতকরা ৯৯টী অথবা সম্ভবতঃ সহস্রের মধ্যে ৯৯৯ অংশ কেবলমাত্র আপনা-আপনি বা অভ্যাসবশতঃই ঘটিয়া থাকে। প্রাতঃকালে আমাদিগের শয্যাত্যাগের মুহূর্ত্ত হইতে প্রত্যহ রাত্রিতে শয্যাগ্রহণ-কাল পর্য্যন্ত আমাদিগের প্রত্যেক কার্য্য—সাজসজ্জা, বস্ত্রপরিধান—বস্ত্রপরিবর্ত্তন, আমাদিগের পানাহার, বিদায়গ্রহণ, অভ্যর্থনা, আদর-আপ্যায়ন, নমস্কার-প্রণাম, উত্থান-উপবেশন, রমণীগণের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন প্রভৃতি, কেবল শুধু ইহাই নহে,—আমাদিগের সাধারণ কথাবার্ত্তাটীও পর্য্যন্ত অধিকাংশই পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠিত হইয়া এরূপ বস্তুতে দৃঢ়রূপে পরিণত হইয়াছে যে, সেগুলিকে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট কার্য্যশ্রেণীর মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে। প্রত্যেক ধারণা বা জ্ঞানের সহিত তাহার উপযুক্ত একএকটী ভাব আমাদিগের হৃদয়ে জাগিয়া উঠিতেছে। মানবজীবনে এই অভ্যাসের যে কি প্রভাব তাহা সম্যক্‌রূপে বর্ণনা করা সুকঠিন! সদভ্যাস যেরূপ মানবের হিতকারী বন্ধু, কদভ্যাস তদ্রূপ মানবের অজ্ঞানানুসারে ভীষণ শত্রু হইয়া দাঁড়ায়, এরূপ কি, তাহার জীবন-সংশয় করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না। একসময়ে একটী যুবতী ভাবী পরিণামের বিষয় কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া প্রত্যহ তাম্বূলের সহিত প্রচুর পরিমাণে তাম্রকূটপত্র বা দোক্তা সেবন করিতে অভ্যাস

করে। কিয়ৎকাল পরে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া সে শ্বশুরালয়ে চলিয়া যায় এবং তথায় অল্পকাল পরেই তাহার উদর স্ফীত হইতে আরম্ভ করে। ইহাতে সকলেই উদ্বিগ্ন হন্ এবং বালিকাকেও যৎপরোনাস্তি উৎকণ্ঠা সহ্য করিতে হয়। অবশেষে বহুঘটনার পর তাহার তাম্রকূটপত্রাহারে স্পৃহতা আগমন করে এবং এই কুঅভ্যাসের জন্য তাহাকে যাহারপর নাই লজ্জানুভব করিতে হয়। আফিং বা তৎশ্রেণীর বিষদ্রব্য-সেবনকারীদিগের কথাও উল্লেখযোগ্য। কারাগারে প্রাণবিয়োগ-নিবারণ-জন্য কোনও কোনও কারারুদ্ধ ব্যক্তিকে অল্পপরিমাণে আফিং প্রভৃতি দিবার ব্যবস্থাও শুনা গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আরও বহু কদভ্যাস আছে, যাহা সকল সময় শক্তিশালী বলিয়া বুঝা যায় না। কোনও ব্যক্তি হারমোনিয়ম-বাদন-রতা প্রেয়সীর সুকোমল-কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে নিদ্রা যাইতেন। ক্রমে ইহা তাঁহার এরূপ কদভ্যাসে পরিণত হইল যে, প্রত্যহ তাঁহাকে নিদ্রাভিভূতা করিবার জন্য তাঁহার পত্নীকে ঐ বাদনযন্ত্র-বাদন করিয়া সঙ্গীত করিতে হইত। এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিলে আর তাঁহার কিছুতেই নিদ্রা হইত না! সুতরাং অনেক সময় যাহা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়, তাহাই সময়ে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করে।

মানবজীবন কতগুলি অভ্যাসের সমষ্টিমাত্র হওয়ায়, মানব যেন ছাঁচে-ঢালা জীবরূপে প্রতীয়মান হয়। তাহার প্রাণ মন দেহ তাহার অতীত জীবনটীর অনুকরণেই ব্যস্ত থাকে। আমরা প্রত্যহ প্রাতঃকালে উত্থান করি, দন্তমুখাদি প্রক্ষালন করিয়া বা আবশ্যক স্নান-শৌচাদি-সমাপনান্তে প্রাতঃসন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিয়া স্ব স্ব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই, তৎপরে আহারাদির পর পুনরায় কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই, ইত্যাদি। প্রত্যহই কি সেই একরূপেই জীবন অতিবাহিত হইতেছে না! সুতরাং, মাতা, পিতা, শিক্ষক, বা অভিভাবকগণ-কর্ত্তৃক বালক-বালিকাদিগের জীবনে এরূপ অভ্যাসশ্রেণী দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, যাহা তাহাদিগের সমগ্রজীবনে হিতকারী বন্ধুর ন্যায়ই কার্য্য করে এবং যাহার প্রভাব তাহারা অতিক্রম করিতে না পারে। বর্ত্তমান সভ্যজগতে এই যে সংখ্যাতীত গ্রন্থরাশি প্রণীত হইতেছে, ইহার উদ্দেশ্য কি? কেহ কি বলিতেছে, 'কামনার উপভোগ কর, জগতের কার্য্য সম্পন্ন হইবে, জগতে যশস্বী হইবে, জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে?' কখনই নহে। যদি কেহ তাহা বলে, তবে তাহা ভ্রান্ত, অগ্রাহ্য। সকলেরই উদ্দেশ্য পুণ্যের জয় ও পাপের নিদারুণ পরাজয়—শোচনীয় পরিণাম, দেখাইয়া মানবকে সদ্দৃষ্টান্তানুসরণে প্রবর্ত্তিত করা, সদাচারশীল করা।—ইহাই শিক্ষার উদ্দেশ্য—'রামের মত হও, রাবণের মত হইও না।' কিন্তু এই সদাচার কিরূপে সম্ভব হইবে? মনোনিবেশপূর্ব্বক দেখিলে দেখা যাইবে যে, এই অভ্যাস-সমষ্টিই সেই সদাচারের স্রষ্টা—ইহা দ্বারাই সদাচার গঠিত হয়।

শিক্ষার উদ্দেশ্য এই যে, তাহা আমাদিগের স্নায়ুমণ্ডলীকে আমাদিগের শত্রু না করিয়া তাহাকে আমাদিগের মিত্র করিয়া দিবে। বৈষয়িক ব্যক্তি যেরূপ প্রভূত ধনের অধিকারী হইয়া সেই ধনকে মূলধনে পরিণত

করেন, বা বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাহার সুদেই ব্যয়নির্ব্বাহ করেন, তদ্রূপ শিক্ষার উদ্দেশ্য এই যে, আমরা আমাদিগের শিক্ষাকে— অর্জ্জিত জ্ঞানকে, মূলধনে পরিণত করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিব। এজন্য যতশীঘ্র সম্ভব, আমরা যতগুলি উপকারী কার্য্যকে আমাদিগের অভ্যাসগত—স্বাভাবিক—করিয়া লইতে পারি, তজ্জন্য পরিশ্রম ও অধ্যবসায় অবলম্বন করিতে হইবে, এবং যাহাতে কদভ্যাসের বশবর্ত্তী হইতে না পারি, তজ্জন্যও তাহার প্রতি বিশেষ সাবধান থাকিতে হইবে। যতদূর সম্ভব, আমাদিগের দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্র-বৃহৎ সমুদায় কার্য্যাবলীকেই স্বতঃসঞ্জাত ক্রিয়ার অনায়াসপ্রদ তত্ত্বাবধানে নিঃক্ষেপ করিতে হইবে; কারণ, ইহার দ্বারা উচ্চতর মানসিক শক্তিনিচয় স্ব স্ব কর্ম্মে সম্পূর্ণরূপে প্রবৃত্ত হইতে পারিবে। প্রাত্যহিক জীবনের কর্ত্তব্যভার এরূপভাবে নিয়মিত করিতে হইবে, যাহাতে সেগুলি যেন স্বতঃই প্রবৃত্ত হয়। যাহার নিকট অস্থিরতা, অসিদ্ধান্ত ব্যতীত কিছুই অভ্যাসগত নহে, যাহার প্রত্যেক কার্য্যটী দোলাচলচিত্তে বহু চিন্তা করিয়া প্রভূত ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে সম্পন্ন করিতে হয়, সেই প্রতিমুহূর্ত্তে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ব্যক্তির অপেক্ষা জগতে অধিকতর কৃপার্হ ব্যক্তি, বোধ হয়, আর নাই। এরূপ ব্যক্তির উষাকালে শয্যাত্যাগ চিন্তার বিষয়, স্নানশৌচাদি ভাবনা-বৃত, আহার-পান এবং গমনাগমনাদিও বহুল-পরিমাণে ভূয়োবিবেচনা ও প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি-প্রয়োগের স্থল।

অভ্যাস-গঠনের কতকগুলি বিধি আছে, তাহা ক্রমান্বয়ে বিবৃত করা যাইতেছে।

১। কোনও নূতন অভ্যাস বদ্ধমূল অথবা কোনও পুরাতন অভ্যাস ত্যাগ করিতে হইলে, আমাদিগকে তদ্বিষয়ে দৃঢ়তম প্রতিজ্ঞা ও অবিচলিত সংকল্প লইয়া অবতীর্ণ হইতে হইবে। সর্ব্ববিধ সাহায্যের দ্বারা এই প্রতিজ্ঞাকে বেষ্টন করিয়া রাখিতে হইবে এবং উচিত বিষয়ে প্রবৃত্তিকে অধিকতর দৃঢ় করিবার জন্য যেরূপ অনুকূল অবস্থাসমূহের প্রয়োজন, তাহারও সৃষ্টি করিতে হইবে। আপনাকে সোদ্যমে এইরূপ অবস্থানিচয়ের মধ্যে স্থাপন করিতে হইবে, যে অবস্থাকুল মানবকে তাহার নবপন্থানুসরণে বলপ্রদান করে—বল্গাবিচ্যুত অশ্বের ন্যায়ই উৎসাহে তাহাকে পরিপূর্ণ করে। এরূপস্থলে পূর্ব্বাভ্যাসের বিরোধী ব্যাপারে মানবকে প্রবৃত্ত হইতে হইবে এবং সম্ভবপর ও আবশ্যক হইলে মানব সাধারণসমক্ষে প্রতিজ্ঞাপাশবদ্ধ হইতেও ত্রুটী করিবেক না।

নবজীবন-দানে ও নূতন অভ্যাসগঠনে উপযুক্ত উন্নচরিত্র মানবের সংসর্গ যে কি উপকার সাধন করে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পাশ্চাত্ত্য কোনও সংবাদপত্রে, কোনও ব্যক্তি এই মর্ম্মে একটী বিজ্ঞান প্রচারিত করিয়াছিল যে, সে-ব্যক্তি তাহার পত্নীর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, আর মদ্যপান করিবেন্ না এবং যদি কেহ তাঁহাকে মদ্যপান করিতে দর্শন করে, তাহা হইলে তিনি তদ্দর্শনকারীকে পঞ্চাশৎ স্বর্ণ মুদ্রা পুরস্কার প্রদান করিবেন্। কথিত আছে, এই উচ্চস্বভাবা নারীর সংস্পর্শে উক্ত ব্যক্তি নবজীবন-লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঐরূপ সহধর্ম্মিণী লইয়াই এবং ঐরূপ পরস্পর

পরস্পরের উন্নতি-সাধনে আবদ্ধ হইয়া, পরস্পরের নিকট অকপটতা লইয়াই নব-জীবন-লাভে—নূতন-অভ্যাস-গঠনে প্রবৃত্ত হইতে হয়। উহাই কি একটী দৃষ্টান্ত ? কি অতীতে, কি বর্ত্তমানে, ভারতের গৃহে গৃহে কি ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা প্রত্যহ দেখিতে পাইতেছি না ? কিন্তু এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব না থাকিলেও ইহার বিপরীত দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। কোনও ব্যক্তি আক্ষেপ-পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, তাঁহার সহধর্ম্মিণী তাঁহার কতকগুলি কদভ্যাস গঠিত করিয়া দিয়াছেন ; —তন্মধ্যে একটী—তাম্বুলের সহিত বাদসাহী জরদা-গ্রহণ। অহোরাত্র প্রত্যেক নরনারী, প্রত্যেক মানব, স্ব স্ব জীবনের সৌন্দর্য্য বা কদর্য্যের ছায়াপাতে অন্যের জীবন সুন্দর বা মলিন করিয়া দিতেছে ! এরূপ মানবচরিত্র, যাহার সংস্পর্শে আসিয়া অপর মানব কিছু ভাল না পাইয়া মন্দই লাভ করে, তাহাদের জীবনে ধিক্। অনেকে বাজী রাখিয়া টাকা নষ্ট করেন, বাজী যদি রাখিতেই হয়, তবে ঐ পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির ন্যায় নবজীবন-গ্রহণেই বাজী রাখা উচিত।

২। দ্বিতীয় বিধি :—যতক্ষণ-পর্য্যন্ত নূতন অভ্যাস জীবনে বদ্ধমূল না হইয়া যাইতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত যাহাতে একটী স্খলনও সম্ভব না হয়, তজ্জন্য বিধিমত প্রাণান্ত যত্ন করিতে হইবে। একটী সূতার গুলি গুটাইতে গুটাইতে যদি তাহা হঠাৎ একবার হস্তচ্যুত হইয়া যায়, তবে তাহাতে যেমন অনেক সূতা খুলিয়া যায়, স্খলনেও ঠিক তদ্রূপ। একটী স্খলনে সকলই নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। বহুপাকে যে সূতাটী গুটান হয়, একটী স্খলনে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী খুলিয়া যায়। স্নায়ুমণ্ডলীকে যথার্থভাবে ও সফলতার সহিত কার্য্য করিতে হইলে, সুদীর্ঘ-শিক্ষাই তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। অধ্যাপক বেন (Bain) বলিয়া গিয়াছেন, 'নৈতিক অভ্যাসের মধ্যে দুইটী পরস্পরবিরোধী শক্তি নিহিত আছে। একটীকে অপরটীর প্রভু করিয়া দিতে হয়। এই কার্য্যে কোনও সংগ্রামে পরাজয় স্বীকার করিলে চলিবে না। অন্যায়-শক্তির প্রত্যেক জয়লাভে ন্যায়-শক্তির বহু-জয়ের ফল নষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ ক্ষেত্রে সর্ব্বাপেক্ষা প্রণিধান যোগ্য বিষয় এই যে, এই দুইটী শক্তিকে এরূপ ভাবে চালিত—এরূপ ভাবে নিয়মিত করা আবশ্যক, যাহাতে ন্যায়-শক্তি অপর শক্তির উপরে অপ্রতিহত-ভাবে সুদীর্ঘ-কাল জয়লাভ করিতে পারে, যে পর্য্যন্ত না পৌনঃপুনিক জয়লাভ ন্যায়শক্তিকে এরূপ দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠাপিত করে যে, যে-কোনও অবস্থাতে তাহা বলবান্ কদভ্যাসের বিরোধ অনায়াসেই অতিক্রম করিতে পারে।

৩। এক্ষণে তৃতীয় বিধি। প্রত্যেক প্রতিজ্ঞা বা দৃঢ় সংকল্পকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সর্ব্বপ্রথম-সুযোগকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। যে মুহূর্ত্তেই সর্ব্বপ্রথম সুযোগ উপস্থিত হইবে, সেই মুহূর্ত্তে তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধরিতে হইবে। নব-জীবন-লাভের প্রত্যেক ভাব বা উদ্দীপনাতে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। সংকল্প বা উচ্চাকাঙ্ক্ষা করিবার মুহূর্ত্তেই তাহা মস্তিষ্কে নূতন গতি আনিয়া দেয় না, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে ইহা মানবজীবনে তদুপযোগী স্বাভাবিক কার্য্য

উৎপন্ন করে, সেই মুহূর্ত্তেই মস্তিষ্কে নূতন ক্রিয়া আনয়ন করে।

জীবনে প্রত্যেক সুযোগে মানুষ যদি তাহার সংকল্পানুসারে কার্য্য না করে, তাহা হইলে, বহু মনোহর বিধি বা নীতিবাক্য মনুষ্যকে কখনও উৎকৃষ্ট স্বভাব প্রদান করিতে পারে না। কোনও মহাত্মা বলিয়াছেন—মানবচরিত্র সম্পূর্ণরূপে গঠিত ইচ্ছার অভিব্যক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহা জীবনের প্রধান প্রধান আবশ্যকঘটনায় দৃঢ়তার সহিত নির্দ্দিষ্ট-পন্থানুসারে কার্য্য করিবার যে প্রবণতা বা প্রবৃত্তি, তাহাই। যে-পরিমাণ অপ্রতিহতভাবে পুনঃ পুনঃ কার্য্য-সকল অনুষ্ঠিত হয় এবং যে-পরিমাণে মস্তিষ্ক তাহাদের প্রয়োজনসাধনে অভ্যস্ত হয়, সেই পরিমাণেই কোনও কার্য্যের প্রবৃত্তি আমাদিগের মধ্যে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। হৃদয়ে যখনই কোনও সদ্ভাবের বা নব উচ্চ সংকল্পের উদ্রেক হইবে, তখন তাহাকে বিফলে যাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। উদ্যমবিহীন ভাবপ্রবণ বা সুপ্ত ব্যক্তি—যাহারা মানুষিক বাস্তব কার্য্যের অনুষ্ঠাতা নহে, তাহাদের পক্ষেই সাধুসংকল্পকে ব্যর্থ করিয়া ফেলা সম্ভব।

৪। চতুর্থবিধি। অল্পবয়স্ক বালকবালিকাদিগের নিকট অত্যধিকমাত্রায় উপদেশচ্ছলে বক্তৃতা দেওয়া বা তাহাদিগের সহিত নিগূঢ় তত্ত্বের আলোচনায় অত্যধিক প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। এরূপ উপদেশ ও আলোচনা শীঘ্রই নিষ্ফল হইয়া যায়। তাহাদিগকে ব্যাবহারিক-জীবনে শিক্ষা দিবার অবসর খুঁজিতে হয়, এবং এইরূপে এককালেই বালকবালিকাদিগের চিন্তা-, অনুভব- ও কার্য্য শক্তির উন্মেষ হইতে পারে। ব্যাবহারিক জীবনের প্রত্যেক ঘাত-প্রতিঘাতই চরিত্রকে নূতন আকার, নূতন ভাব প্রদান করে।

সকল সৎকার্য্যেরই অভ্যাস রাখা উচিত, নতুবা পরে আপনার দ্বারাই আপনাকে প্রতারিত হইতে হয়। দার্শনিক পণ্ডিত ডারুউইন্ বাল্যবয়সে অত্যন্ত কবিতাপ্রিয় ছিলেন, কিন্তু পরবর্ত্তী জীবনে একপংক্তি কবিতা-পাঠও সহ্য করিতে পারিতেন না। তাঁহার হৃদয় পৃথক্ পৃথক্ বস্তুর আলোচনা হইতে উৎসর্গ বা সাধারণ বিধি প্রণয়ন করিবার যেন একটা যন্ত্র হইয়াছিল। এই বিশেষ বিশেষ শক্তির লোপ অতীব দুঃখজনক;—ইহা বুদ্ধিবৃত্তি এবং নৈতিক চরিত্রেরও ক্ষতিকারক;—কারণ, ইহাতে ভাবপ্রকৃতি শিথিল হইয়া যায়।

ব্যায়ামাভাবে আমাদিগের মানসিক শক্তির হ্রাস হইয়া থাকে। কবিতা, আলেখ্য, সঙ্গীত, আধ্যাত্মিক ও ধর্ম্মবিষয়ের সংস্পর্শে থাকিতে হইলে আমাদিগের রুচিকে যথোপযুক্ত আহার্য্য প্রদান করিতে হইবে। নতুবা, বিরোধি-আকর্ষণে ঐ রুচি বা তদ্বিষয়ক প্রীতি লুপ্ত হইয়া যায়। প্রত্যহ কিঞ্চিৎ সময় কবিতা, আধ্যাত্মিকতত্ত্ব-পাঠ, ধ্যান-ধারণা প্রভৃতিতে ব্যয়িত করা কর্ত্তব্য। এইরূপ রুচিকে অগ্রাহ্য করিয়া রাখা উচিত নহে। কারণ, তাহাতে ঐ রুচি বিনষ্ট হইয়া যায়। বয়ঃপ্রাপ্ত এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী বালকবালিকাদিগকে এতদ্বিষয়ে উপযুক্ত সময়ে সতর্ক করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

মানসিক ও পৈশিক বিশ্রাম-বিধি।—এতদুদ্দেশে কেহ কেহ প্রত্যহ কিয়ৎক্ষণ নিয়মিত

প্রাণায়ামাদির অভ্যাস করেন, অধ্যাত্ম-বিষয়ে ধ্যানধারণা করেন। ইহা যে কতদূর উপকারক, তাহা বলা সুকঠিন। ইহার ফল—(১) কায়িক বিশ্রাম, (২) শরীরযন্ত্রে অযথা চাপের অভাব, (৩) মুখাকৃতির শান্ত ও কোমলভাব, (৪) অস্থিরতার অভাব, ইত্যাদি। বালকবালিকাগণও তাহাদিগের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর মৃদু করিতে শিক্ষা করিবে, চঞ্চলতা পরিত্যাগ করিয়া পেশী-সকলকে বিশ্রাম দিবে এবং যখন বসিয়া থাকিবে, তখন শান্তভাবেই থাকিবে ;—অধিক চঞ্চলতা থাকিবে না।

৫। পঞ্চমবিধি।—প্রত্যহ কিয়ৎক্ষণ নিয়মিত ব্যায়াম-দ্বারা কার্য্যশক্তিকে সঞ্জীবিত রাখা কর্ত্তব্য। প্রত্যহ অথবা দুই বা এক দিবস অন্তর কিঞ্চিৎ কঠিন কার্য্য সাধিত করা কর্ত্তব্য, যাহাতে ভীষণ সংগ্রামের মুহূর্ত্তে, ঘোর পরীক্ষার ক্ষণে চিত্তকে ভীত করিতে না পারে। এইপ্রকার তপস্যা, বৈরাগ্য বা সন্ন্যাস —যাহা মানুষকে স্থির মনঃসংযোগের, সোৎসাহ ইচ্ছার ও সামান্য অপ্রয়োজন দ্রব্যের জন্যও আত্মত্যাগের অভ্যাসে অভ্যস্ত করে, তাহাই মানবকে এইরূপে জীবনের মহা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য প্রস্তুত করিয়া দেয়।

অভ্যাসবিধির সহিত অবিসংবাদী হঠাৎ পরিবর্ত্তন।—নব নব উৎসাহ ও উত্তেজনা পাইলে মানব নূতন নূতন অভ্যাস গঠন করিয়া লইতে পারে। সংকটাপন্ন অবস্থায়, মানবের হৃদয়ে বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হইলে মনুষ্য তাহার পূর্ব্ব প্রাচীন অভ্যাসসমূহকে ছিন্নভিন্ন ও উৎপাটিত করিয়া ফেলিয়া দেয় এবং নূতন স্থায়ীভাবের আবেশে নূতন অভ্যাস গঠিত করে। এইরূপে নূতন অভ্যাসের বলে বলীয়ান্ হইয়া তাহারা নূতন প্রকৃতি—নূতন জীবন, ধারণ করে।

স্বভাবের উপর অভ্যাসের অতি গুরুতর প্রভাব।—স্বভাবের কোমল বা নমনীয় অবস্থাতেই তৎপ্রতি যুবক-যুবতীগণের অবধান আবশ্যক। কারণ, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহারা গতিশীল-অভ্যাস-সমষ্টিমাত্র ব্যতীত কিছুই নহে। পাপ বা পুণ্যাচরণের ক্ষুদ্রতম ঘাতপ্রতিঘাতও মানব-হৃদয়ে দুরপনেয় চিহ্ন রাখিয়া যায়। আমরা একবার যাহা করি, তাহাকে কিছুতেই মুছিয়া ফেলা যায় না। বিভিন্ন কার্য্য, বিভিন্ন মুহূর্ত্তের সমষ্টিই সাধু-চরিত্র, সুনিপুণ কর্ম্মী প্রভৃতির সৃষ্টি করে। কর্ম্মাহের প্রতিমুহূর্ত্ত, প্রতিদণ্ড উপযুক্তরূপে ব্যবহার করিতে হইবে। এইরূপেই মানব স্ব স্ব কর্ম্মে সুদক্ষ হইয়া উঠিবে। বিভিন্ন বিচার-কার্য্য মনুষ্যকে নির্ভুল গভীর-বিচারের অভ্যাস দান করিবে, যাহা তাহার চিত্তে চিরদিনের সম্পত্তি হইয়া থাকিবে। সুতরাং, বালক-বালিকা ও যুবক-যুবতীদিগকে সদভ্যাস গঠনের মূল্য অবগত করাইয়া, তাহাতে তাহাদিগকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবার জন্য প্রত্যেক মাতা, পিতা, শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী, অভিভাবক বা অভিভাবিকার সর্ব্বতোভাবে যত্ন করা অবশ্যকর্ত্তব্য। ইহা কি গুরুতর দায়িত্বভার! এই দায়িত্বের উপেক্ষাতেই আজ বঙ্গদেশের এত হীনাবস্থা! কেবল সুযোগ্য পিতা, শিক্ষক বা অভিভাবক হইলে চলিবে না, সুযোগ্য মাতার আবশ্যকতা।

জননীর ন্যায় মহাশিক্ষয়িত্রী আর কেহই

নাই। কিন্তু কত সহস্র সহস্র জননী আজ এই গুরুতর দায়িত্বজ্ঞানের অভাবে জ্ঞানপূর্ব্বক আপন সন্তান-সন্ততির মধ্যে যে কত কদভ্যাসের বীজবপন করিয়া দিতেছেন, তাহা ভাবিলে কোনও মহাপ্রাণ ব্যক্তি অশ্রুপাত হইতে বিরত হইতে পারেন্ না।

জননীকে দুর্ব্বলতা পরিহার করিয়া প্রেমের সহিত সন্তানের প্রতি শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে হইবে, তবে সন্তান মানুষ বলিয়া জগতে পরিচিত হইতে পারিবে। একদিনে ইহা সম্ভবপর নহে, সুদীর্ঘ অভ্যাসই এই দুর্বল জাতিকেই এই শক্তি প্রদান করিবে। জননীই শিশুদিগের শিক্ষার জন্য দায়ী। তাঁহারা শৈশবে শিশুহৃদয়ে যে বীজ উপ্ত করিয়া দেন, তাহা সমগ্র জীবনেও শিশু ভুলিতে পারে না। কোনও মহাত্মা বলিয়াছিলেন—"আমাকে সুমাতা দাও, আমি জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতির সৃষ্টি করিয়া দিব।" সুতরাং, কি গুরুতর দায়িত্ব লইয়া সংসারে নরনারী বিচরণ করিতেছেন্, তাহা তাঁহারা একবার উপলব্ধি করুন্। এতৎ-প্রবন্ধ-পাঠে শুধু জনক নহেন, সন্তানের জননীগণও যদি স্ব স্ব দায়িত্ব উপলব্ধি করিয়া, আত্মোন্নতি-কল্পে দৃঢ়সংকল্প হন্ এবং সন্তান-হৃদয়ে সদভ্যাস-গঠনে গভীর মনোযোগ প্রদান করেন, তাহা হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

শ্রী—

---

# প্রার্থনা।

দয়াময়, পাই যেন তোমারি করুণা ;—
ভয়েতে অভয় দিও শোকেতে সান্ত্বনা।
ভরসা-রূপেতে হৃদে ক'রো অধিষ্ঠান,
নিরাশ-জীবনে যবে উঠিবে তুফান।
শোকের আগুনে যদি পোড়ে হৃদিখান্
করুণা-সলিলে তব করিও নির্ব্বাণ।
অরাতি আমার যদি থাকে এ ধরায়,
সমুচিত শাস্তি যেন তোমা হ'তে পায়!
ঐশ্বর্য্য-গৌরবে যেন হৃদয় আমার,
মত্ত হয়ে নাহি উঠে ওগো সারাৎসার!
কুচিন্তা মানসে যেন নাহি পায় স্থান,
সযতনে পালি যেন তোমারি বিধান।
জনমে, মরণে তব রাতুল চরণে
রেখো সদা বিশ্বরাজ, অধম এ-জনে।

শ্রীমতী শৈবলিনী দাসী।

---

# সাময়িক প্রসঙ্গ।

ইংলণ্ডের ন্যাসানাল সোসিয়ালিষ্টদিগের সভায় ভারতবর্ষের কথা।—এইরূপ প্রকাশ, গত ১৭ই আগষ্ট ইংলণ্ডের অন্তর্গত নর্দাম-টন নগরে ইংলণ্ডের ন্যাসানাল সোসিয়ালিষ্ট-দিগের বার্ষিক অধিবেশনে মিঃ হিণ্ডম্যান এই প্রস্তাব করেন্ যে, সত্বর ইংলণ্ডের অধীনতা হইতে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিতে হইবে। কি প্রণালীতে স্বাধীন করা হইবে,

তাহা ভারতের প্রতিনিধিবর্গ ও ইংলণ্ডের জনসাধারণ নির্দ্ধারণ করিবেন। সোসিয়ালিষ্ট সভায় এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

বিমানপোতে ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে যাইবার ব্যবস্থা।—ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ড পর্য্যন্ত বিমানপোতের নিয়মিত যাতায়াতের ব্যবস্থা হইবে। তদুদ্দেশ্যে তিনখানি অতি-বৃহৎকার 'সি-প্লেন'-নামক বিমানপোত গত ১৮ই আগষ্ট ইংলণ্ড হইতে ফ্রান্সের সেণ্টরা-ফেলে উপস্থিত হইয়া তথা হইতে মিশরযাত্রা করিয়াছে। উক্ত বিমানপোত-তিনখানি শীঘ্রই ভারতবর্ষে আসিয়া পৌছিবে।

ছাত্রীদিগের পরীক্ষার নিয়ম।—এতদিন এই নিয়ম ছিল যে, ছাত্রীরা কোন স্কুল হইতে পরীক্ষার্থিনী না হইলেও প্রাইভেট ছাত্রীরূপে পরীক্ষা দিতে পারিবেন। সম্প্রতি ঐ নিয়মের পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। পরীক্ষার পূর্ব্বে একবৎসরের মধ্যে, যে-সকল ছাত্রী কোনও স্কুলে পড়িয়াছে, তাহারা সিণ্ডিকেটের অনুমতি ভিন্ন প্রাইভেট ছাত্রীরূপে পরীক্ষা দিতে পারিবে না। এই নূতন নিয়মে ছাত্রীদের প্রাইভেট পরীক্ষা দিবার কিঞ্চিৎ অসুবিধা ঘটিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মহাযুদ্ধের ব্যয়—গত ১৮ই আগষ্ট বিলাতে প্রধান মন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জ্জ পার্লামেণ্টের কমন সভার বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, ইউরোপের মহাযুদ্ধে পৃথিবীর প্রত্যক্ষরূপে মোট খরচ হইয়াছে, চারি হাজার কোটি পাউণ্ড অর্থাৎ ষাট হাজার কোটি টাকা। এত অর্থব্যয়ের পর পৃথিবীকে স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইতে বহুদিন লাগিবে।

মহাসমরে হতাহতের হিসাব।—গ্রেট-ব্রিটনের মোট ২৪,৫৩,২৬৬ অর্থাৎ পুরুষ-জন-সংখ্যার ১০'৭১ ব্যক্তি মহাসমরে হত, আহত ও নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছে। ফ্রান্সের ২১,৩৮,১০০, বেলজিয়ম ৯৩,০৬১ ইটালীর—১,৯,৩৭,০০০ হতাহত হইয়াছে। জন-সংখ্যার অনুপাতে হতাহতের শতকরা হার এইরূপ—ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ৪'৫১, ফ্রান্স ৪'৩২, সার্বিয়া ৩'৫৬, বেলজিয়ম ০'৭৮, মার্কিণ যুক্তরাজ্য ০'২২।

ভারতবর্ষে সিবিল-সার্বিস-প্রবেশপ্রার্থী-দিগের যোগ্যতা-বিচারের পরীক্ষা।—সিবিল সার্বিস-প্রবেশের সময় বিভাগীয় প্রার্থীদের যোগ্যতা-বিচারের জন্য ভারতবর্ষে কোয়েটা, লাহোর, লক্ষ্ণৌ এবং পুনা, এই চারি কেন্দ্রে পরীক্ষা গৃহীত হইবে।

বড়লাটের অনুরোধ।—"ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট" পত্রে প্রকাশ, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বড়লাট বাহাদুরের নিকট হইতে একখানি পত্র পাইয়াছেন। তাহাতে বড়লাট বাহাদুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে তাঁহার "স্যার"-উপাধি-ত্যাগ-পত্র প্রত্যাহার করিয়া লইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ছাত্রীদিগের বিশেষ বৃত্তি।—নিম্নলিখিত ছাত্রীগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করিয়াছেন।

প্রথম শ্রেণী—মাসিক ২০৲ টাকা।

জ্যোৎস্নাময়ী দাস—ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়।

দ্বিতীয় শ্রেণী—মাসিক ১৫৲ টাকা।

সুষমা কুলভী—ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়, অমিয়া গুহ—চট্টগ্রাম খাস্তগির, বিভা মিত্র—ডাওসিশন, লাবণ্যপ্রভা দাস—ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী, সুজাতা রায়—ডাওসিশন, মৃণ্ময়ী বসু—ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী।

তৃতীয় শ্রেণীর—মাসিক ১০৲ টাকা।

লীলাময়ী দাসগুপ্ত—ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী, সুষমা সেনগুপ্ত—ঢাকা ইডেন, কনকলতা দাসগুপ্ত—ডায়োসিশন, বীণা বানার্জ্জী—দার্জ্জিলিং মহারাণী, গ্লাডিস জ্যোতির্ম্ময়ী সেন—ডায়োসিশন, প্রীতিলতা ভট্টাচার্য্য—বেথুন, রেণুকা চৌধুরী—ইউনাইটেড মিশনরি, হিমানী সরকার—বেথুন, করুণা চক্রবর্ত্তী—ব্রাহ্ম-বালিকা শিক্ষালয়, মণিকুন্তলা সেন—ভিক্টোরিয়া ইন্‌ষ্টি।

ইংলণ্ডে নারী-প্রতিনিধি-প্রেরণ ও বোম্বাই-য়ের মহিলাদের কার্য্য—ভারত-নারীগণ যাহাতে নির্ব্বাচনের অধিকারে বঞ্চিত না হন্ সেই উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে নারী-প্রতিনিধি-প্রেরণের জন্য এক সভা হয়। শ্রীমতী পেটিট্ ঐ সভায় সভাপত্নীর কার্য্য করেন। শ্রীমতী পেটিট্ জানাইয়াছেন যে, স্যার শঙ্কর নায়ার মহিলা-প্রতিনিধিদিগকে জয়েণ্ট কমিটিতে তাঁহাদের বক্তব্য জ্ঞাপনের সুব্যবস্থা করিয়া দিবেন; তিনি এই কার্য্যে মহিলাদিগকে সর্ব্বথা সহায়তা করিবেন। শ্রীমতী হীরাবাই তাতা ও তাঁহার কন্যা কুমারী আর ডেসিব তাতা মহিলা-প্রতিনিধি মনোনীতা হইয়া বিলাত-যাত্রা করিয়াছেন।

---

# নিরুদ্দেশ।

( গল্প )

১

কৃষ্ণবিহারীবাবু বসন্তপুরের জমিদার। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় তাঁহার বৈঠকখানায় প্রকাণ্ড মজলিস্ বসে, খুব গান-বাজ্‌না আমোদ-প্রমোদ চলে, খাওয়া-দাওয়ার খুব ধুমধাম হয়। কাজেই, অনেক মোসাহেবও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হন্। একদিন পাশাখেলার খুব ধুম পড়িয়া গিয়াছে, অন্য-দিকে গান্‌বাজ্‌না চলিতেছে, কিন্তু কৃষ্ণবিহারী বাবু সে-দিন ইহার কোনদিকে যোগদান করিতেছেন না। তিনি কয়েকজন লোক লইয়া গল্পগুজব করিতেছেন। এমন সময় রাধানাথ রায় কৃষ্ণবাবুকে বলিলেন, "দেখুন্ কৃষ্ণবাবু, গরীবের আবার এত স্পর্দ্ধা কেন?" কৃষ্ণবাবু বলিলেন, "আপনার কথার ত কোন অর্থ সংগ্রহ করতে পার্‌লাম না, একবার স্পষ্ট করেই বলুন্ না, কি হয়েছে?" রাধানাথ একটু ক্রোধের ও ক্ষোভের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "হবে আবার কি? বলি, গরীব গরীবই থাক্‌বে, তার আবার অত কেন? আজ ইস্কুলে ইনেস্পেক্টরবাবু এসে-ছিলেন, জানেন্ বোধ হয়। তা রামজীবন মুখুজ্যের ছেলে স্তন্‌লে বুঝি, একটু ভাল বল্‌তে পেরেছে, সেই জন্যে রামজীবন মুখুজ্যে গাঁয়ে ঢাক পিটিয়ে বেড়াচ্ছে,—'আমার ছেলে ফার্ষ্ট হ'য়েছে, ইনিস্পেক্টর আমার ছেলেকে এবার এসে পুরস্কার দেবেন!'" আরও একটু অতিরঞ্জিত করিয়া মাত্রা বাড়াইয়া রাধানাথ বলিলেন, "আরও শুন্‌লাম না কি বলছে যে, রমেন্দ্র কিছুই পারে নি। এও কি কখনও হয়? আপনার ছেলে রূপে গুণে যেন কার্ত্তিকটী! আহা! সে

পার্‌লে না, আর ঐ হতভাগা ছোঁড়াটা সব বল্‌লে ?”

রাধানাথের কথা শুনিয়া কৃষ্ণবাবু বলিলেন, “তা হবে। তা’ কি হ’তে পারে না ? জমিদার বলে কি ভগবানের উপর জমিদারী চলে ? তিনি যা’কে যে-রকম বুদ্ধিমান্ ক’রে গড়ে তুলেচেন, সে সেই রকমই হবে।” এই কথাগুলি তিনি বলিলেন বটে, কিন্তু পুত্রের না পারার কথা ভাবিয়া তাঁহার মুখখানি ঈষৎ রোষে লাল হইয়া উঠিল এবং তিনি একটু ভ্রূকুটী করিলেন। এই সময় তাঁহার ইচ্ছা হইল, তিনি পুত্রকে ডাকিয়া সমস্ত জিজ্ঞাসা করেন্ এবং তাহাকে একটু তিরস্কারও করেন ; কিন্তু কোন দিন যাহাকে কিছু বলেন্ নাই, তাহাকে পরের কথায় কেন তিরস্কার করিতে যাইবেন্ ? এই সমস্ত ভাবিয়া তিনি কিছুই বলিলেন না।

এই সকল কথা-বার্ত্তার পর কৃষ্ণবিহারী বাবু আমোদ-প্রমোদে আর তত মন দিতে পারিলেন না ; কিয়ৎক্ষণ পরে সকলকে বিদায় দিয়া অন্দর-মহলে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু অন্যদিনের ন্যায় প্রথমে আহার করিতে বসিলেন না। সহধর্ম্মিণী মায়াদেবী বলিলেন, “কি, অমন ক’রে এসে শুয়ে পড়্‌লে যে ? আজ কি খাওয়া দাওয়া কর্‌তে হবে না ? রাত্‌ ত কম হয় নি ! রাত্রি ১১টা বাজে !” স্ত্রীর কথার উত্তরে “হাঁ যাই” বলিয়া আরও কিছুক্ষণ শুইয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন— “রমেন্দ্র আজ কিছুই বল্‌তে পারে নি, আর সুনীল বেশ ভাল বলেছে ? দু’জনেই ত ভাল ছেলে ! ইত্যাদি।” সুনীলের উপর তাঁহার একটু বিদ্বেষ জন্মাইতে লাগিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনি আবার ভাবিতে লাগিলেন, “সংসারে মানুষ এইরকম করিয়াই জলিয়া পুড়িয়া মরে ! দেখিতেছি, সংসারের লোক অতিশয় পশু, নতুবা এরূপ পরের অনিষ্ট-চিন্তায় ফিরিত না, এবং তাহাকে এরূপ জ্বলিতে পুড়িতেও হইত না। বালক সুনীলের কেমন সুন্দর আকৃতি ! আহা ! কেমন কোমল স্বভাব ! কেমন মিষ্টভাষী ! আমি তাহাকে কত ভালবাসি ! তা’র বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ! না ! কখনই শুনিব না। যাক্, সে ভাল বলিতে পারিয়াছে, আর রমেন্দ্র পারে নাই, তাহাতে কি ? রমেন্দ্র আর সুনীলে আমি কোন পার্থক্য দেখিব না। আর মায়াও যে তাহাকে ঠিক্ মায়ের মতই ভালবাসে !” এই সমস্ত ব্যাপার মনোমধ্যে আলোচনা করিতেছেন, এমন সময় মায়া দেবী পুনরায় আসিয়া বলিলেন, “আর কতক্ষণ শুয়ে থাকবে ? এস।” কৃষ্ণ-বিহারীবাবু উঠিয়া খাইতে গেলেন, কিন্তু ভাল করিয়া খাইতে পারিলেন না। মায়াদেবী তাহা দেখিয়া বলিলেন, “তুমি আজ কিছুই খাইলে না কেন, বল ত ?” কৃষ্ণবাবু বলিলেন, “আমার বড় মাথা ধরিয়াছে।” তৎপরে স্বামীর আহার সমাপ্ত হইলে মায়া আহার করিয়া স্বামীর মাথা টিপিয়া দিতে লাগিলেন ! কৃষ্ণবিহারীবাবু কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে আশ্রয় লইলেন।

কৃষ্ণবিহারীবাবু তাহার পরদিন সকালে উঠিয়া হাতমুখ ধুইয়া নিজ-কন্যা শান্তিলতাকে ডাকিয়া বলিলেন, “মা শান্তু, কাল তোদের স্কুলে ইনেস্পেক্টর এসেছিলেন না ? তিনি

আসিয়া তোমাকে কি বল্লেন?” শান্তি মৃদুভাবে বলিতে লাগিল, “তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তুমি কি পড় মা?’ আমি বল্লাম, ‘সাহিত্যনীতি।’ তিনি আমাকে গোটাকতক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমিও উত্তর দিলাম।” কৃষ্ণবাবু বলিলেন, “রমেনদের ক্লাসে কে ভাল বল্‌তে পেরেছিল, বল্‌তে পারিস্?” শান্তি বলিল, “হেডমাষ্টার-ম’শয় আমাদের মাষ্টার-ম’শয়কে বল্‌ছিলেন, আমি শুন্‌লাম যে, সুনীল-দা সকলের চেয়ে ভাল বলতে পেরেছে এবং তিনি আরও বল্লেন, ‘সুনীলের ন্যায় বুদ্ধিমান ছেলে খুব কমই দেখা যায়।’ কিন্তু দাদাও বেশ বলেছেন, বলছিলেন। ইন্সপেক্টর ওই ক্লাসের দুটী ছেলেরই খুব প্রশংসা করে গেলেন, বল্‌ছিলেন। তিনি এবার এসে সুনীলদাকে একটা পুরস্কার দেবেন, বলেছেন।” কৃষ্ণবিহারী বাবু রাধানাথের মিথ্যা বিদ্বেষপূর্ণবাক্য মন হইতে দূরীভূত করিয়া সুস্থ হইলেন এবং কন্যাকে চুম্বন করিয়া বিদায় দিলেন।

২

এইস্থানে সকলের একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কৃষ্ণবিহারীবাবুর একমাত্র পুত্র এবং শ্রীমতী শান্তিলতা দেবী তাঁহার একমাত্র কন্যা। পুত্রের বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর এবং কন্যাটীর বয়স সপ্তমবর্ষ অতীত হয় নাই। কৃষ্ণবিহারী বাবুর বিস্তীর্ণ জমিদারী, কিন্তু তাঁহার জমিদারীর তুলনায় তাঁহার তত আড়ম্বর নাই, এবং প্রথম হইতেই তিনি পুত্রকে শিক্ষার জন্য অন্যত্র প্রেরণ করেন নাই। গ্রামে একটী মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় আছে। তাহাতে অনেক ছাত্র গরীব দেখিয়া কৃষ্ণবিহারী বাবুকেই বিদ্যালয়ের প্রায় সমস্ত ভার বহন করিতে হয়। রমেন্দ্র ঐ বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে পড়ে। কন্যাটী নিম্নশ্রেণীতে অধ্যয়ন করে। পল্লীগ্রামে স্ত্রীশিক্ষার নিমিত্ত কোন পৃথক্ বন্দোবস্ত না থাকায় সেও দাদার সহিত ঐ স্কুলেই যায়। শিক্ষকমহাশয় পৃথক্‌ভাবে বসাইয়া তাহাকে শিক্ষা দেন। মায়াদেবী কৃষ্ণবিহারী বাবুর স্ত্রী। তিনি একজন শিক্ষিতা রমণী। তিনি কন্যাকে স্বয়ংই শিক্ষা দিতে পারিতেন এবং দিতেনও; কিন্তু কন্যা দাদার সহিত বিদ্যালয়ে যাইতে চাওয়ায় অগত্যা তাঁহারা তাহাকে বিদ্যালয়ে ঐরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। সে নিত্যই মায়ের নিকট সুশিক্ষা পাইত এবং বিদ্যালয়েও যাইত। রামজীবন মুখোপাধ্যায় গ্রামের একজন মধ্যবিত্তলোক, কোন রকমে সংসার নির্ব্বাহ করেন্। তবে শুনা যায়, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত সামান্য কিছু টাকা ছিল, সেইজন্য রামজীবন মুখুজ্যে এ পর্য্যন্ত কাহারও নিকট হাত পাতে নাই। তাঁহারই পুত্র শ্রীমান্ সুনীলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সুনীল রমেন্দ্রের প্রায় সমবয়সী এবং একশ্রেণীতেই পড়িত। দুইজনের মধ্যে যে বন্ধুত্ব তাহা সাধারণ বন্ধুর মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। রামজীবন মুখুজ্যের কেবল এক চিন্তা, কি করিয়া তিনি ছেলেটীকে লেখাপড়া শেখাইয়া মানুষ করিবেন। তাঁহার ঐ একমাত্র পুত্রটীর প্রতি যখন তিনি চাহিতেন, তখন তাঁহার হৃদয়ের রক্ত শুকাইয়া যাইত। রামজীবন মুখুজ্যের বাড়ীতে আপনার স্ত্রী এবং পুত্র ছাড়া আর কেহ ছিল না।

তিনি একজন বড় ভক্ত ছিলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যা-আহ্নিক, ব্রাহ্মণের নিত্যকৃত্য সম্পন্ন না করিয়া জলস্পর্শ করিতেন না। কাজেই তিনি ভগবানের উপর ভার দিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন। তিনি বলিতেন, "যাক্, তার ভাবনা কি? সে ত ভগবানের সন্তান! তাঁর সন্তান তিনি একরূপ করিয়া মানুষ করিবেনই।" রাধানাথ, সে দিন যাহার কথা বলিতেছিলাম, তিনি একজন মহাবিষয়ী লোক এবং মহাসংসারী। মিথ্যাকথা বলা? এবং চতুরতায় তিনি একজন প্রধান। এবং কখনও কখনও তিনি গর্ব্ব করিয়া বলেন, "এ-জগতে পয়সা যদি করতে কেহ চায়, তবে রাধানাথের কাছে যেন আসে।" তাঁর চরিত্র সুন্দর বলা সাধুলোকেরও সাধ্যাতীত। কাহার একহাত জায়গা নিজে লইতে পারিবেন্, মনে মনে দিবারাত্র তিনি তাহারই আলোচনা করিতেন। নিজের ইষ্ট না থাকিলেও পরের অনিষ্ট করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কৃষ্ণবিহারীবাবু সুনীলকে ভাল বাসিতেন, রাধানাথের তাহা সহ্য হইত না। কাজেই তিনি যে কোন উপায়ে এই ভালবাসায় বিচ্ছেদ ঘটাইতে পারেন, তাহার জন্য বিধিমতে চেষ্টা ও যত্নের ক্রটী করিতেন্ না। কিন্তু এবার কৃতকার্য্য না হওয়াতে, পুনরায় সূত্র অন্বেষণে উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন।

কৃষ্ণবিহারীবাবুর ভার্য্যা মায়াদেবী সুনীলকে নিজ পুত্র কন্যা হইতে বিভিন্নতা দেখাইতেন না। অপরাহ্ণে বিদ্যালয়ের ছুটীর পর সুনীল রমেন্দ্রদের বাটীতে আসিত। মায়াদেবী তিন জনকেই খাবার খাইতে দিতেন। খাইয়া তিনজনে বেড়াইতে যাইত। এইরূপে কতদিন কাটিয়াছে এবং প্রত্যহই এইরূপ কাটিতেছে।

একদিন খাবার খাইয়া তিনজনে নদীর ধারে বেড়াইতেছে, এরূপ সময় রমেন্দ্র বলিল, "ভাই সুনীল, এস এইখানে বসি।" এই বলিয়া নদীর ধারে একটী বড় অশ্বত্থ গাছের তলে তিনজনে উপবেশন করিল। রমেন্দ্র প্যাণ্টালুন পরিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু সুনীল কোথায় পাইবে? সে সেই বিদ্যালয়ের কাপড় আর জামাটী পরিয়াই আসিয়াছিল। শান্তি বলিল, "সুনীল-দা! তুমি দাদার মত পোষাক প'রে আস নি কেন?" সুনীল বলিল, "বোন্, আমরা গরীব লোক, ও-রকমভাব পোষাক কি করে পরে আস্‌ব?" ঐসময় রমেন্দ্র শান্তির দিকে একটু চোখ্ রাঙাইয়া তাকাইতেই শান্তি ক্ষুদ্র বালিকা হইলেও বুঝিয়া ফেলিল এবং তৎক্ষণাৎ কথা উল্টাইবার জন্য বলিল, "দেখ, সুনীল-দা, কেমন পাখীর ছানা দেখ! ঐ গাছের উপর! আমাকে ঐরকম একটা পাখীর ছানা দেবে?" সুনীল বলিল, "দেখ বোন্, আমি যদি ওর মায়ের কাছ থেকে ওকে কেড়ে নিয়ে যাই, তবে ওর কত কষ্ট হবে, ওর মায়েরও কত কষ্ট হবে, বল দেখি?" শান্তি "তবে থাক্" বলিয়া সুনীলের কাছে সরিয়া আসিয়া সুনীলের ক্রোড়ে শুইয়া পড়িল। শান্তি চুপ করিলে, সুনীল আর রমেন্দ্র কথা বলিতে আরম্ভ করিল। রমেন্দ্র বলিল, "দেখ সুনীল, ইনেস্পেক্টরবাবু বলে গেলেন, তোমাকে একটা পুরস্কার দেবেন্। তুমি ভাই, বেশ পড়াশুনা বলতে পার, তোমাকে ত দেওয়া উচিতই। আমি একটা মূর্খ।" সুনীল

বলিল, "না ভাই! তুমিও ত বেশ বলেছিলে। তবে কেন আর দুঃখ কর, ইনেস্পেক্টর বাবু তোমার কি সুখ্যাতি করেন নি? ইনেস্পেক্টারবাবু যে পুরস্কার দেবেন, তা হেড্‌মাষ্টার-মহাশয়কে বলে দুইজনে ভাগ ক'রে নেব।" এমন সময় হঠাৎ শান্তি বলিল, "সুনীলদা, তুমি বড় হ'লে আমাদের ভুলে যাবে না? তখন তুমি একজন মস্ত বড়মানুষ হবে, বড় চাক্‌রী ক'র্‌বে, তখন কি তোমার আমাদের মনে থাক্‌বে? এখন কেবল আদর কর, তখন আর মনেও হবে না।" আরও কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় সুনীল বাধা দিয়া বলিল, "থাক্. তোকে আর বক্‌তে হবে না, তোদের যেদিন ভুলে যাব, সে-দিন আর এ-জগতে থাক্‌ব না। তখন তোরাই ভুলে যাবি। রমেন্দ্র তখন কত বড় জমিদার হবে, তুই কোন্ রাজার ঘরে রাণী হবি। আমাদের মত গরীবের কথা কি তোদের মনে থাক্‌বে?" বিবাহের কথা শুনিয়া লজ্জাচ্ছলে শান্তি সুনীলের কোলের মধ্যে মুখ লুকাইল। ইহাতে রমেন্দ্র ঈষৎ হাসিল।

হায় বালিকা! তুমি জান না, একটু একটু করিয়া তুমি সন্ধ্যারজনীর অস্ফুটস্ত কুঁড়ির মধ্য হইতে তোমার সুবাস একটু একটু করিয়া জগতে বিকীরণ করিতেছ। সেই সুবাসে মুগ্ধ হইয়া সুনীল শুধু একদিনের জন্য নয়, চিরদিন তোমায় হৃদয়ে ধারণ করিবার জন্য ছুটিয়া আসিবে।

শান্তি বলিল, "সুনীল-দা, আমি বেশ বকুল ফুলের মালা গাঁথ্‌তে পারি, তুমি নেবে? আমি কাল তোমায় একটা দেব, আর যদি চাও এবার থেকে রোজ একটা ক'রে দেব।" সুনীল বলিল, "দিস্, আমি ফুল বড় ভাল বাসি, আর বকুলফুলের মালাও ত অতি-চমৎকার, কেমন মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ!" শান্তি সুনীলের নিকট এরূপ আদর পাইয়া গড়াইয়া পড়িল। সুনীল-দা, তোমার মা আমাকে কেমন সুন্দর করে চুলবেঁধে দিয়েছেন, দেখ, আবার কেমন ফুল গুঁজে দিয়েছেন, দেখ। সুনীল শান্তির চিবুক ধরিয়া আদর করিয়া বলিল, "হাঁ রে শান্তি; তোকে ভারী সুন্দর দেখাচ্চে।" শান্তি ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "নাও, নাও, তোমার আর আদর ক'র্‌তে হবে না। আমাকে তিনি কত খাবার দেন, তোমাদের ত দেন না? আমি পেঁপে খেতে বড় ভাল-বাসি, তাই রোজ আমাকে খেতে দেন।" রমেন্দ্র বলিয়া উঠিল, "ওঃ, তাই বুঝি আমরা পাই নে! তুই বুঝি সব খেয়ে আসিস্?" এই বলিয়া ভাই বোনে ঝগ্‌ড়া বাধাইল। সে ঝগড়া অতিসুন্দর। রমেন্দ্র হাসিতে হাসিতে বোন্‌কে একটা আস্তে কীল মারে, আবার তাহাকে চুম্বন করে। তাহাদের আদরের ঝগড়া থামিলে পর, সুনীল বলিল, "চল ভাই রমেন্দ্র, বাড়ী যাই।" তখন তিন-জনেই উঠিয়া পড়িল।

সূর্য্যদেব তখন দিবসের কার্য্য সমাপ্ত করিয়া পশ্চিমগগনে দিগ্বলয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জগতের নিকট একটী ক্ষুদ্র নিশার জন্য বিদায় লইতেই যেন তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইতেছিল। সেই নিমিত্তই বুঝি, তাঁহার তেজোদীপ্ত বদনখানি স্বর্ণরাগ-রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল। নদীর জল, বৃক্ষের পত্র, সমস্তই যেন সমদুঃখে দুঃখিত হইয়া লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছিল! বিহগগণ কাকলী করিয়া যেন ভগবানের নিকট নিবেদন করিতেছিল, "হে সর্ব্বান্তর্যামী দেবতা, আদিত্যদেবকে আমাদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিও না, এ দীর্ঘনিশায় বিচ্ছেদবেদনা আমরা কিরূপে সহ্য করিব?" এই সময় তিনজনে বাটীর নিকট পৌঁছিলে, ভাইবোনের নিকট বিদায় লইতে সুনীলের প্রাণেও বড় কষ্ট হইতে লাগিল। অবশেষে বিদায় লইয়া সে আপন বাটীতে চলিয়া গেল।

---

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও
শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

# বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 676. December, 1919.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৭ বর্ষ। ৬৭৬ সংখ্যা। | অগ্রহায়ণ, ১৩২৬। ডিসেম্বর, ১৯১৯। | ১১শ কল্প। ৪র্থ ভাগ।

## পঙ্কে শতদল।

পঙ্ক-মাঝারে লুকা'য়ে রেখেছ শতদল,
মেঘের মাঝারে লুকা'য়ে রেখেছ হাসি,
মরুর মাঝারে রেখেছ ঝর্ণা-জল,
দুখের মাঝারে সুখের রশ্মি-রাশি।
মধ্যাহ্নে মোর হেরি ঘন মেঘজাল,
জানি জানি তবু ফুটিবে রবির হাসি;
যতই আঁধারে কাটুক নিশীথ-কাল,
জাগিবে প্রভাত আলোক-সাগরে ভাসি!
বিচ্ছেদ-কাঁটা দেয় সে দারুণ দুখ,
মিলন-পদ্ম উঠিবে রে তবু ভাসি;
আসিবে রে প্রভু, জুড়া'বে পরাণ বুক,
নিবিড় মিলনে মিলা'বে ব্যথার রাশি॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল,।

---

## অষ্টাবক্র গীতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

### একোনবিংশপ্রকরণ।

তত্ত্ববিজ্ঞানসন্দংশমাদায় হৃদয়োদরাৎ।
নানাবিধপরামর্শশল্যোদ্ধারঃ কৃতো ময়া ॥১॥

আমি তত্ত্বজ্ঞানরূপ সাঁড়াশীর দ্বারা হৃদয়ের মধ্য হইতে নানাবিধ সঙ্কল্পবিকল্পরূপ কণ্টক তুলিয়া ফেলিলাম।১।

ক্ক ধর্ম্মঃ ক্ক চ বা কামঃ ক্ক চার্থঃ ক্ক বিবেকিতা।
ক্ক দ্বৈতং ক্ক চ বাদ্বৈতং স্বমহিম্নি স্থিতস্য মে ॥২

আমি নিজের মহিমায় অবস্থিত। এখন আমার ধর্ম্মই বা কি, কামই বা কি, অর্থই বা কি, বিবেকজ্ঞানই বা কি, ভেদজ্ঞানই বা কি, অভেদজ্ঞানই বা কি?

ক্ক ভূতং ক্ক ভবিষ্যদ্বা বর্ত্তমানমপি ক্ক বা।
ক্ক দেশঃ ক্ক চ বা নিত্যং স্বমহিম্নি স্থিতস্য মে ॥৩

আমি নিজের মহিমায় নিত্য অবস্থিত। আমার পক্ষে এখন ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান-কালও নাই, দেশও নাই, কিছুই নাই।৩।

ক চাত্মা ক চ বা নাত্মা ক শুভং কাশুভং তথা।
ক চিন্তা ক চ বাচিন্তা স্বমহিম্নি স্থিতস্য মে ॥৪॥

আমি নিজের মহিমায় অবস্থিত। আমার এখন আত্মা অনাত্মা, শুভ অশুভ, চিন্তা অচিন্তা কিছুই নাই।৪।

ক স্বপ্নঃ ক সুষুপ্তির্বা ক চ জাগরণং তথা।
ক তুরীয়ং ভয়ং বাপি স্বমহিম্নি স্থিতস্য মে ॥৫॥

আমি নিজের মহিমায় অবস্থিত; আমার এখন জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি বা তুরীয় অবস্থা কিছুই নাই, কোন ভয় নাই। (কেহ কেহ ইহাকে তুরীয়াতীত অবস্থা বলেন)।

ক দূরং ক সমীপং বা বাহ্যং কাভ্যন্তরং ক বা।
ক স্থূলং ক চ বা সূক্ষ্মং স্বমহিম্নি স্থিতস্য মে ॥৬॥

আমি নিজের মহিমায় অবস্থিত। আমার এখন কোন পদার্থই দূর বা সমীপ নহে, বাহ্য বা আভ্যন্তর নহে, স্থূল বা সূক্ষ্ম নহে।৬।

ক মৃত্যুর্জীবিতং বা ক লোকাঃ কাস্য ক লৌকিকম্।
ক লয়ঃ ক সমাধির্বা স্বমহিম্নি স্থিতস্য মে ॥৭॥

আমি নিজের মহিমায় অবস্থিত; আমার এখন জীবনমৃত্যু, লোক, লৌকিকভাব, লয় বা সমাধি কিছুই নাই।৭।

অলং ত্রিবর্গকথয়া যোগস্য কথয়াপ্যলম্।
অলং বিজ্ঞানকথয়া বিশ্রান্তস্য মমাত্মনি ॥৮

আমি এখন আত্মস্বরূপে বিশ্রাম লাভ করিয়াছি; এখন ধর্ম-অর্থ-কামরূপ ত্রিবর্গের কথায় প্রয়োজন নাই, যমনিয়ম আসন-প্রাণায়াম প্রত্যাহার-ধারণা ধ্যান-সমাধি প্রভৃতি যোগের কথায় প্রয়োজন নাই, শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন প্রভৃতির দ্বারা আত্মবিজ্ঞানের কথারও প্রয়োজন নাই।৮।

ইতি অষ্টাবক্রগীতার আত্মবিশ্রান্তিনামক একোনবিংশপ্রকরণ।

## বিংশপ্রকরণ।

ক ভূতানি ক দেহো বা কেন্দ্রিয়াণি ক বা মনঃ।
ক শূন্যং ক চ নৈরাশ্যং মৎস্বরূপে নিরঞ্জনে ॥১॥

আমার স্বরূপ নিরঞ্জন অপরিবর্ত্তনীয় উপাধিরহিত; ইহাতে পঞ্চভূত দেহ ইন্দ্রিয় মন শূন্য বা নৈরাশ্য কিছুই নাই।১।

ক শাস্ত্রং কাত্মবিজ্ঞানং ক বা নির্বিষয়ং মনঃ।
ক তৃপ্তিঃ ক বিতৃষ্ণাত্বং গতদ্বন্দ্বস্য মে সদা ॥২॥

আমার ভাবাভাবরূপ সর্বপ্রকার দ্বন্দ্ব অপগত হইয়াছে, অতএব এখন শাস্ত্রাভ্যাস আত্মতত্ত্ববিচার, বিষয়চিন্তা দূর করিয়া মনের লয়সাধন, স্বরূপতৃপ্তি, বিষয়বৈরাগ্য—এ সমস্ত কিছুরই প্রয়োজন নাই।২।

ক বিদ্যা ক চ বাবিদ্যা কাহং কেদং মম ক বা।
ক বন্ধঃ ক চ বা মোক্ষঃ স্বরূপস্য ক রূপিতা ॥৩

আত্মস্বরূপে অবস্থিত আমার বিদ্যা, অবিদ্যা, অহংজ্ঞান, জগতের জ্ঞান, 'আমার দ্রব্য'—এইরূপ জ্ঞান, বন্ধন, মোক্ষ বা রূপ কিছুই নাই।৩।

ক প্রারব্ধানি কর্ম্মাণি জীবন্মুক্তিরপি ক বা।
ক তদ্বিদেহকৈবল্যং নির্বিশেষস্য সর্বদা ॥৪॥

আমি নির্বিশেষ আত্মস্বরূপে অবস্থিত, আমার প্রারব্ধকর্ম, জীবন্মুক্তি বিদেহকৈবল্য, এ সমস্ত কিছুই নাই।৪।

ক কর্ত্তা ক চ বা ভোক্তা নিষ্ক্রিয়ং স্ফুরণং ক বা
কাপরোক্ষং ফলং বা ক নিঃস্বভাবস্য মে সদা ॥৫॥

আমার কোনরূপ স্বভাব নাই অর্থাৎ কোনরূপ বৈশিষ্ট্যযুক্ত অবস্থাই আমার প্রকৃত

ভাব নহে। অতএব কর্ত্তা, ভোক্তা, নিষ্ক্রিয় স্ফূর্ত্তিমাত্রাবস্থা, অপরোক্ষানুভূতি, বা বিষয়াকারবৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যরূপ ফল—এরূপ কোন ভাবই নাই।৫।

ক্ব লোকঃ ক্ব মুমুক্ষুর্ব্বা ক্ব যোগী জ্ঞানবান্ ক্ব বা।
ক্ব বদ্ধঃ ক্ব চ বা মুক্তঃ স্ব-স্বরূপেঽহমদ্বয়ে ॥৬॥

অদ্বয়াত্মরূপ স্ব-স্বরূপে ভূরাদিলোক, মুমুক্ষু, যোগী, জ্ঞানী, বদ্ধ, মুক্ত, কিছুই নাই।

ক্ব সৃষ্টিঃ ক্ব চ সংহারঃ ক্ব সাধ্যং ক্ব চ সাধনম্।
ক্ব সাধকঃ ক্ব সিদ্ধির্ব্বা স্ব-স্বরূপেঽহমদ্বয়ে ॥৭॥

অদ্বয়াত্মরূপ স্ব-স্বরূপে সৃষ্টিসংহার, সাধ্য-সাধন, সাধক-সিদ্ধি, কিছুই নাই।৭।

ক্ব প্রমাতা প্রমাণং বা ক্ব প্রমেয়ং ক্ব চ প্রমা।
ক্ব কিঞ্চিৎ ক্ব ন কিঞ্চিদ্বা সর্ব্বদা বিমলস্য মে ॥৮

উপাধিরহিত বিমল আত্মরূপ আমার প্রমাতা প্রমাণ প্রমেয় প্রমা, অথবা আর কিছুই নাই, এমন কি কিছুই নাই—ইহাও নাই।৮।

ক্ব বিক্ষেপঃ ক্ব চৈকাগ্র্যং ক্ব নির্বোধঃ ক্ব মূঢ়তা
ক্ব হর্ষঃ ক্ব বিষাদো বা সর্ব্বদা নিষ্ক্রিয়স্য মে ॥৯॥

আমি নিষ্ক্রিয় আত্মরূপ, আমার বিক্ষেপ, একাগ্রভাব, সর্বজ্ঞতা, মূঢ়তা, হর্ষ, বিষাদ, কিছুই নাই।৯।

ক্ব চৈষ ব্যবহারো বা ক্ব সা পরমার্থতা।
ক্ব সুখং ক্ব চ বা দুঃখং নির্বিমর্শস্য মে সদা ॥১০

সর্বদা সঙ্কল্পবিকল্পরহিত আমার ব্যাবহারিক দশাও নাই, পারমার্থিক দশাও নাই, সুখও নাই, দুঃখও নাই।১০।

ক্ব মায়া ক্ব চ সংসারঃ ক্ব প্রীতির্বিরতিঃ ক্ব বা।
ক্ব জীবঃ ক্ব চ তদ্ব্রহ্ম সর্ব্বদা বিমলস্য মে ॥১১॥

সর্বদা উপাধিরহিত বিমল আত্মরূপ আমার পক্ষে মায়া, সংসার, প্রীতি, বিরতি, জীবভাব, ব্রহ্মভাব কিছুই নাই।১১।

ক্ব প্রবৃত্তির্নিবৃত্তির্ব্বা ক্ব মুক্তিঃ ক্ব চ বন্ধনম্।
কূটস্থনির্বিভাগস্য স্বস্থস্য মম সর্ব্বদা ॥১২॥

সর্বদাই আত্মস্বরূপে অবস্থিত কূটস্থ নির্বিকার ভেদশূন্য আমার প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-মুক্তি-বন্ধন কিছুই নাই।১২।

ক্বোপদেশঃ ক্ব বা শাস্ত্রং ক্ব শিষ্যঃ ক্ব চ বা গুরুঃ।
ক্ব চাস্তি পুরুষার্থো বা নিরুপাধেঃ শিবস্য মে ॥১৩॥

উপাধিশূন্য নিত্যানন্দস্বরূপ আমার পক্ষে উপদেশই বা কি, শাস্ত্রই বা কি, শিষ্যই বা কে, গুরুই বা কে, পুরুষার্থই বা কি আছে?(১৩

ক্ব চাস্তি ক্ব চ বা নাস্তি ক্বাস্তি চৈকং ক্ব চ দ্বয়ম্
বহুনাত্র কিমুক্তেন কিঞ্চিন্নোত্তিষ্ঠতে মম ॥১৪॥

আমি আত্মস্বরূপ, এ-কারণ আমার পক্ষে অস্তিত্বও নাই, নাস্তিত্বও নাই, একত্বও নাই, দ্বৈতভাবও নাই; অথবা এইরূপ কল্পিত পদার্থের প্রতিষেধ কোটি বৎসরেও সম্ভব নহে। অতএব অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, আমার নিকটে কল্পনার কোনপ্রকার আভাসই উত্থিত হয় না; কারণ, আমি একরূপ চৈতন্যমাত্র।১৪।

ইতি অষ্টাবক্রগীতায় জীবন্মুক্তি-নামক বিংশপ্রকরণ।

## একোনবিংশ প্রকরণ।

দশষট্‌চোপদেশে স্যুঃ শ্লোকাশ্চ পঞ্চবিংশতিঃ।
সত্যাত্মানুভবোল্লাসে উপদেশে চতুর্দশ ॥১॥

ষড়ুল্লাসে লয়ে চৈবোপদেশে চ চতুশ্চতুঃ।
পঞ্চকং স্যাদনুভবে বন্ধমোক্ষে চতুষ্ককম্ ॥২॥

নির্বেদোপশমে জ্ঞানে এবমেবাষ্টকং ভবেৎ।
যথাসুখং সপ্তকঞ্চ শান্তৌ স্যাদ্বেদসম্মিতম্ ॥৩॥

তত্ত্বোপদেশে বিংশচ্চ দশ জ্ঞানোপদেশকে।
তত্ত্বস্বরূপে বিংশচ্চ শমে চ শতকং ভবেৎ ॥৪॥

অষ্টকং চাত্মবিশ্রান্তৌ জীবন্মুক্তৌ চতুর্দশ।
ষট্‌সংখ্যাক্রমবিজ্ঞানে গ্রন্থৈকাত্ম্যং ততঃ পরম্ ॥৫॥

বিংশত্যেকমিতৈঃ খণ্ডৈঃ শ্লোকৈরাত্মাগ্নি-মধ্যগৈঃ।
অবধূতানুভূতেশ্চ শ্লোকাঃ সংখ্যাক্রমা অমী ॥৬

| | | | |
|---|---|---|---|
| এই গ্রন্থের গুরূপদেশ-নামক প্রথম প্রকরণে শ্লোকসংখ্যা | | | ১৬ (?১৯) |
| " সত্যাত্মানুভবোল্লাস-নামক দ্বিতীয় | " | " | ২৫ |
| " আক্ষেপোপদেশ-নামক তৃতীয় | " | " | ১৪ |
| " অনুভবোল্লাস-নামক চতুর্থ | " | " | ৬ |
| " লয়-নামক পঞ্চম | " | " | ৪ |
| " উপদেশ-নামক ষষ্ঠ | " | " | ৪ |
| " অনুভব-নামক সপ্তম | " | " | ৫ |
| " বন্ধমোক্ষ-নামক অষ্টম | " | " | ৪ |
| " নির্বেদ-নামক নবম | " | " | ৮ |
| " উপশম-নামক দশম | " | " | ৮ |
| " জ্ঞান-নামক একাদশ | " | " | ৮ |
| " এবমেব-নামক দ্বাদশ | " | " | ৮ |
| " যথাসুখ-নামক ত্রয়োদশ | " | " | ৭ |
| " শান্তি-নামক চতুর্দশ | " | " | ৪ |
| " তত্ত্বোপদেশ-নামক পঞ্চদশ | " | " | ২০ |
| " জ্ঞানোপদেশ-নামক ষোড়শ | " | " | ১০ (?১১) |
| " তত্ত্বস্বরূপ-নামক সপ্তদশ | " | " | ২০ |
| " শম-নামক অষ্টাদশ | " | " | ১০০ |
| " আত্মবিশ্রান্তি নামক ঊনবিংশ | " | " | ৮ |
| " জীবন্মুক্তি-নামক বিংশ | " | " | ১৪ |
| " সংখ্যাক্রমবিজ্ঞান-নামক একবিংশ | " | " | ৬ |
| তাহার পর গ্রন্থসমাপ্তি। সর্বসমেত একবিংশতিখণ্ডে | | " | ৩০২(?) |

অবধূতানুভূতির শ্লোক ও সংখ্যাক্রম এইরূপ। ১—৬।

ইতি অষ্টাবক্রগীতায় সংখ্যাক্রম-বিজ্ঞান-নামক একবিংশ প্রকরণ।

---

# গানের স্বরলিপি।

## শরতের গান।

ভৈরবী—একতালা।

আকাশের এই নীল আবরণ
　　　　ভালো বাসি।
গন্ধ-বিভল দখিন পবন
　　　　ভালো বাসি।
এই যে শ্যামল তরু-বীথি,
মর্ম্মরিয়া উঠ্‌চে নিতি ;
কুঞ্জবনের আবছায়া এই
　　　　ভালো বাসি।
এই কোকিল-কূজন অলি-গুঞ্জন
　　　　ভালো বাসি।
এই জলে ছায়া-ছবি সৃজন
　　　　ভালো বাসি।
ভালোবাসি ফুলের রাশি,
তারার আলো, চাঁদের হাসি ;
এই দুঃখ-সুখের মধুর বাঁশী
　　　　ভালো বাসি॥

কথা ও সুর—শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র বড়াল, বি-এল্।

স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা।

আস্থায়ী।

২´　　　　　৩　　　　　০　　　　　১
II {মা মা -া। মা -া মা। মপদা -পা দা। পদা জ্ঞা -ঋসা I
　আ কা ০ শে র এই নী০ ০ ল আ ব০ র ০ণ

২　　　　　৩　　　　　০　　　　　১
I সা -া -ঋা। জ্ঞমা ঋজ্ঞা ঋা। সা -া -া। -া -া -া} I
　ভা ০ ০ লো ০ বা সি ০ ০ ০ ০ ০

২´　　　　　৩　　　　　০　　　　　১
I সা -া দা। পা পা -া। পণা দা দপা। মজ্ঞা জ্ঞা -া I
　গ ন্ ধ বি ভ ল দ০ খি ন প ব ন

২´ ৩ ০ ১
I জ্ঞা -া -পমা। পমা পা -মা। দা -া -া। -পমজ্ঞা -ঋা -সা I
ভা ০ ০০ লো ০ বা ০ সি ০ ০ ০০০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I সা -া -ঋা। জ্ঞমা ঋজ্ঞা ঋা। সা -া -া। -া -া -া II
ভা ০ ০ লো ০ বা সি ০ ০ ০ ০ ০

অন্তরা।

২´ ৩ ০ ১
II {পদা -া দা। দা দা -ণা। ণা ণা -র্সা। র্সা -া র্সা I
এই ০ যে শ্যা ম ল ত রু ০ বী ০ থি

২´ ৩ ০ ১
I র্সা -া র্ঋা। র্ঋা র্সা -ণা। -র্সার্ঋ -র্ঋা র্ঋা। র্সা ণা -দা} I
ম র্ ম রি য়া ০ উ ঠে ছে নি তি ০

২´ ৩ ০ ১
I দা -া দা। দা দা -া। পণা -া দা। পা -মা জ্ঞা I
কু ঞ্ জ ব নে র আ০ র্ ছা য়া ০ এই

২´ ৩ ০ ১
I জ্ঞা -া -পমা। পমা -া পমা। দা -া -া। -পমজ্ঞা -ঋা -সা I
ভা ০ ০০ লো ০ ০ বা ০ সি ০ ০ ০০০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I সা -া -ঋা। মা ঋজ্ঞা ঋা। সা -া -া। -া -া -া II
ভা ০ ০ লো ০ বা সি ০ ০ ০ ০ ০

সঞ্চারী।

২´ ৩ ০ ১
সা II ঋা -া সণ্া। দ্া দ্া ঋণ্া। সা -া জ্ঞা। জ্ঞঋা ঋজ্ঞা -ঋসা I
এই কো ০ কিল কু জ ন অ ০ লি গু ঞ্ জ ০ন

২´ ৩ ০ ১
I সা -া -ঋা। জ্ঞমা ঋজ্ঞা ঋা। সা -া -া। -া -া সা I
ভা ০ ০ লো ০ বা সি ০ ০ ০ ০ "এই"

২´ ৩ ০ ১
সা I সা সদা -া। পা পা -া। ণা দা -পা। মা জ্ঞা -া I
এই জ লে০ ০ ছা য়া ০ ছ বি ০ স্ব জ ন

২´ ৩ ০ ১
I জ্ঞা -া -পমা। পমা -া পমা। ণদা -া -া। -পমজ্ঞা -ঋা -সা I
ভা ০ ০০ লো০ ০ বা০ সি০ ০ ০ ০০০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I সা -া -ঋা। জ্ঞমা জ্ঞা ঋা। সা -া -া। া -া সা II
ভা ০ ০ লো ০ বা সি ০ ০ ০ ০ "এই"

আভোগ।

২´ ৩ ০ ১
II {পা -মা মা। দা দা -ণা। ণা ণা -র্সা। র্সা র্সা -া I
ভা ০ লো বা সি ০ ফু লে র রা শি ০

২´ ৩ ০ ১
I র্সা র্সর্ঋা -া। র্ঋা র্সা -ণা। র্সা র্সর্ঋা -র্ঋা। র্সা ণা -দা} I
তা রা র আ লো ০ চাঁ দে র হা সি ০

২´ ৩ ০ ১
I দা দা দা। দা দা -া। পণা দা -া। পা -মা জ্ঞা I
এই দুঃ খ সু খে র ম০ ধু র বাঁ ০ শী

২´ ৩ ০ ১
I জ্ঞা -া -পমা। পমা পা -মা। দা -া -া। -পমজ্ঞা -র্ঋা -সা I
ভা ০ ০০ লো০ বা ০ সি ০ ০ ০০০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I সা -া -ঋা। জ্ঞমা -মজ্ঞা ঋা। সা -া -া। -া -া -া II II
ভা ০ ০ লো ০ বা সি ০ ০ ০ ০ ০

# সোনার-কমল।

(১)

মাঘ মাস; বেলা অপরাহ্ণ। পল্লীগ্রামে শীতের প্রকোপ এখন অত্যন্ত অধিক। তাহার উপর সকাল হইতেই মেঘ করিয়া, বাতাস বহিয়া, দরিদ্র পল্লীবাসীদিগের অঙ্গে যেন তুষার ঢালিয়া দিয়াছিল। হঠাৎ মেঘগুলা পশ্চিমদিকে জড় হইয়া তুমুল ঝড় উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি। পলাশপুর-গ্রামের এণ্ট্রান্স্ স্কুলে একটা সভার অধিবেশন ছিল। তথাকার জমীদার শ্রীমান্ শ্রীপতিমোহন সেই স্কুলের সম্পাদক। সেই অধিবেশনে যোগ দিবার নিমিত্ত সে-দিন তাঁহাকেও পলাশপুর-গ্রামে আসিতে হইয়াছিল। ফিরিবার সময় অকস্মাৎ পথে এই দুর্যোগ। পল্লীগ্রামের ক্ষুদ্র অপরিসর পথ, ঘোড়ার গাড়ী চলে না। শ্রীপতি সাইকেলে আসিয়াছিলেন এবং তাহাতেই ফিরিতেছিলেন। তাঁহার পূর্ণ যৌবন, সুস্থ সবল দেহ; দেহে অপরিসীম শক্তি; হৃদয়ে পূর্ণ উদ্যম, মনে প্রবল উৎসাহ। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বৃষ্টিতে ভিজিয়া গেল, ঝাপ্টার পর ঝাপ্টা আসিয়া প্রতিপদে তাঁহার গমনে বাধা দিতে লাগিল, কিন্তু তিনি সে-সমস্তই অবহেলা করিয়া সাইকেল দ্রুত চালাইয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু আর যাওয়া চলে না। মাথার উপর করকা-বর্ষণ আরম্ভ হইল। সাইকেলের চাকা খারাপ হইয়া গেল। শ্রীপতি এবার বিপদে পড়িলেন। এখান হইতে এখনও তাঁহার বাটী দুই ক্রোশ পথ। এই জল ঝড় দুর্যোগের মধ্য দিয়া দুইক্রোশ পথ হাঁটিয়া যাওয়া সহজ সাধ্য নয় ভাবিয়া, তিনি নিকটে একখানি কুটির দেখিয়া সেই কুটীর-দ্বারে আসিয়া দ্বারে করাঘাত করিলেন। ভিতরে একটী ছিল; কুকুর সে ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিল। ভিতর হইতে নারীকণ্ঠে কে বলিল, "ভুলি! চুপ্ কর্! চুপ্ কর্!" ভুলি কিন্তু তাহাতে চুপ না করিয়া আরও দ্বিগুণভাবে চিৎকার করিতে লাগিল। শ্রীপতি দ্বার ঠেলিয়া বলিল, "ভিতরে কে আছেন? অনুগ্রহ ক'রে একবার দরজাটা খুলে দিন না? বাহিরে বড় বৃষ্টি!"

ভিতর হইতে নারীকণ্ঠে উত্তর হইল—"কে?"

শ্রীপতি বলিলেন, "আমি পথিক। বৃষ্টির জন্যে কষ্ট পাচ্ছি। অনুগ্রহ ক'রে দরজাটা যদি খুলে দেন, তাহলে একটু ভিতরে দাঁড়াই।"

দ্বার মুক্ত হইল। জনৈক বিধবা রমণী দ্বার খুলিয়া দিলেন। শ্রীপতি ভিতরে প্রবেশ করিলেন। একজন অপরিচিত পুরুষকে দেখিয়া বিধবা স্ত্রীলোকটী মাথার কাপড়টী টানিয়া কিঞ্চিৎ সরিয়া দাঁড়াইলেন। কুকুরটা শ্রীপতিকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। কুকুরটাই তাঁহাদের রক্ষক। কুকুরকে অতিথির উপর আক্রমণোদ্যত দেখিয়া একটী দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা তাহাকে ডাকিয়া সস্নেহে তাহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। কুকুরটা তখন শান্ত হইয়া শ্রীপতির পায়ের কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। পরে বালিকাটী

গৃহের মধ্যে গিয়া বিধবা মাতার গলাটী জড়াইয়া ধরিয়া চুপি চুপি তাঁহার কানে কানে বলিল, "মা, উনি আমাদের জমিদার!"

মাতা জমীদারের নাম শুনিয়া শঙ্কিতভাবে বলিলেন, "কে বল্লে?"

বালিকা বলিল, "আমি ওঁকে চিনি। গত বৎসর যখন আমাদের স্কুলে প্রাইজ হয়, উনি আমাকে প্রাইজ দিয়েছিলেন্। উনি খুব ভাল লোক।"

শ্রীপতির জমিদারির এলাকার মধ্যে প্রত্যেক গ্রামেই বিদ্যালয়, বালিকা-বিদ্যালয় প্রভৃতি ছিল। এ-সমস্ত শ্রীপতির ইচ্ছা ও যত্নেরই ফল। দেশের উন্নতি-কল্পে যুবক তাঁহার জমিদারীর আয়ের অধিকাংশই ব্যয় করিতেন। তাঁহার ঐকান্তিক যত্নে কৃষি-বাণিজ্যাদিরও বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। দেশমধ্যে তাঁহার সুনাম সর্ব্বত্রই শ্রুত হইত।

সিক্তবস্ত্রে দারুণ শীতে শ্রীপতি অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিলেন। মাথার চুলের ভিতর হইতে টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতেছিল। বিধবা অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "ভিতরে আসুন্।" বিধবা আগে আগে চলিলেন, পশ্চাতে শ্রীপতি কুটীর-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বাস্তবিক শ্রীপতির সুন্দর-সৌম্য-মূর্ত্তি-দর্শনে ভয়ের কোন কারণই ছিল না। তাঁহার মুখে যেন একটা অপূর্ব্ব শ্রী এবং সরলতা প্রতিভাত ছিল। বিধবা শ্রীপতির হাতে একখানি ধৌত বস্ত্র দিয়া বলিলেন, "কাপড়টা ছেড়ে ফেলুন্, শীতে বড়ই কষ্ট পাচ্ছেন্।"

শ্রীপতি কোনও দ্বিরুক্তি না করিয়া বিধবার নিকট হইতে কাপড়খানি লইয়া ভিজা কাপড় ছাড়িয়া ফেলিলেন; এবং নিজের চাদরটা নিংড়াইয়া মাথাটা বেশ করিয়া মুছিয়া ফেলিলেন। বিধবা একটা মাদুর পাতিয়া শ্রীপতিকে বসিতে দিলেন। শ্রীপতি দেখিলেন, ঘরে আসবাব-পত্র অতি-সামান্য! দরিদ্রের ঘরে যেরূপ হইয়া থাকে। ঘরের একপার্শ্বে একখানি চৌকি; তাহাতে অতিসামান্য শয্যা; এক কোণে খানকতক কাঁসা-পিতলের তৈজস ও একটা টিনের বাক্স; দেয়ালের গায়ে একটা ছোট আল্না, তাহাতে মাতা ও কন্যার কয়েকখানি ধৌতবস্ত্র। আর একধারে দেয়ালের গায়ে একখানা তক্তা আঁটা; তাহার উপর কতকগুলি বই। সমস্ত জিনিষগুলিই বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তাঁহাদের আকৃতি-প্রকৃতি এবং আচার-ব্যবহার দেখিয়া শ্রীপতির মনে হইল না যে, তাঁহারা কোন হীন-বংশোদ্ভবা; মনে হইল, যেন অতীত কালে তাঁহারা কোন সম্ভ্রান্ত গৃহ অলঙ্কৃত করিয়া ছিলেন; দৈবদুর্ব্বিপাকে এই অবস্থা। শ্রীপতি বস্ত্র-পরিবর্ত্তন করিয়া কোঁচার খুঁটটী গায়ে দিয়া মাদুরের উপর উপবেশন করিলেন। কিছু দূরে মাটির উপর বিধবা রমণীটি বসিলেন। বালিকা নীরবে শ্রীপতির পরিত্যক্ত সিক্ত বস্ত্রগুলি লইয়া বেশ করিয়া নিংড়াইয়া দাওয়ায় টাঙ্গাইয়া দিল। বিধবার সহিত শ্রীপতিমোহনের বাক্যালাপ আরম্ভ হইল। বৃষ্টি সমভাবেই পড়িতেছিল। ক্রমশঃ সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকারে কুটীরখানি ছাইয়া ফেলিল। বালিকা দীপ জ্বালিল। শ্রীপতি বলিলেন, "আপনার মেয়েটি ত বেশ শান্ত দেখ্‌ছি! আর এই বয়সে কাজকর্ম্মও ত বেশ শিখেছে।"

রমণী বলিলেন, "হাঁ, সংসারের সমস্ত

কাজই ঐ করে; আমাকে কিছুই কর্‌তে দেয় না; রাঁধ্‌তেও সব শিখেছে।”

শ্রীপতি। কি আশ্চর্য্য! এইটুকু মেয়ে রাঁধ্‌তে পর্য্যন্ত জানে?

বিধবা। হ্যাঁ পারে। আর না পার্‌লে চল্‌বে কেন গরিবের ঘরে?

শ্রীপতি। আচ্ছা, আপনার এই মেয়েটিকে যেন কোথায় দেখেছি দেখেছি বলে আমার মনে হচ্ছে।

বিধবা ধীরে ধীরে বলিলেন, “ও আপনার পলাশপুরের বালিকা-বিদ্যালয়ের একজন ছাত্রী।”

শ্রীপতি তখন পূর্ব্বস্মৃতিবলে বালিকাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “ওহো! ঠিক্ ঠিক্, তুমিই না গত বৎসর ফার্ষ্ট হয়ে ছিলে? তোমারই নাম বুঝি—কমলরাণী?”

বালিকা সলজ্জ মৃদু হাস্তের সহিত কেবলমাত্র মাথা নাড়িয়া জানাইল—‘হ্যাঁ’; তাহার পর লজ্জাবনত-বদনে মাতার পার্শ্বে নীরবে বসিয়া রহিল। শ্রীপতি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিলেন, কি সুন্দর সে মুখখানি! এমন স্নেহভারে অবনত, সরলতা-মণ্ডিত মুখ তিনি যেন জীবনে আর কখনও দেখেন নাই।

বাহিরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল। শ্রীপতি একবার বাহিরে আসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া চিন্তিত ভাবে বলিলেন, “তাই ত! আজকের রাত্রের মধ্যে যে বৃষ্টি থামে, তা তো মনে হয় না!” বিধবাও তাঁহার কথার সমর্থন করিয়া বলিলেন, ‘সেই রকম গতিক ত' দেখ্‌তে পাচ্ছি!” শ্রীপতি আবার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্বোক্ত মাদুরে উপবেশন করিলেন। একে কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, তাহাতে ভীষণ দুর্য্যোগ; বাহিরে সূচিভেদ্য অন্ধকার। শ্রীপতি তাঁহার হাতের ঘড়িটার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, রাত্রি প্রায় নয়টা বাজে। তিনি চিন্তিত ভাবে বলিলেন, “তাই ত! রাত ন'টা বাজে, বৃষ্টি ত এখন পর্য্যন্ত কম্'ল না। আমি মনে করেছিলুম্ আধ ঘণ্টার মধ্যে বৃষ্টি থেমে যাবে, কিন্তু বৃষ্টি থাম্‌বার ত কোন লক্ষণই দেখ্‌তে পাচ্ছি না। আমি আপনাদের বড়ই কষ্ট দিলুম্! এইবার উঠি তা হলে।” এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বিধবা রমণী ব্যতিব্যস্ত হইয়া বলিলেন, “সে কি! এই বৃষ্টি-অন্ধকারে দু' ক্রোশ পথ হেঁটে কেমন করে বাড়ী যাবেন্! সে কি হয়?” শ্রীপতি বলিলেন, “আমি রাত্রে থাকৃলে আপনাদের বড়ই কষ্ট হবে!” বিধবা বলিলেন, “আমাদের কষ্ট কিছু হবে না, বাবা! তবে এ কুঁড়ে ঘরে থাক্‌তে আপনারই কষ্টের সীমা থাকবে না।”

শ্রীপতি বলিলেন, “আমার কষ্ট! ওঃ, আপনার এই আশ্রয়টুকু পেয়ে বেঁচে গিয়েছি। নইলে আজ আমাকে যে কি বিপদে পড়্‌তে হ'ত তা বল্‌তে পারি না।” উপায়ান্তর না দেখিয়া অগত্যা সে রাত্রির মত সেই কুটীরে বাসই তাঁহার স্থিরীকৃত হইল। তখন বিধবা অতিবিনয়-সহকারে বলিলেন, “এতক্ষণ আপনাকে কিছু বল্‌তে পারি নি, কিন্তু রাত্রে যখন থাক্‌বেন্ তখন সমস্ত রাত্ উপবাসী থাক্‌বেন্ কেমন করে? তবে আমাদের গরীবের ঘরে আপনার খাবার উপযুক্ত কোন জিনিষই নেই। আপনি আমাদের রাজা, তাতে অতিথি। আপনি

উপবাসী থাকলে আমাদের ভয়ানক পাপ হবে। যদি অনুগ্রহ ক'রে অনুমতি করেন, তা'হলে যাই হোক্ খুদ-কুঁড়া যা আছে,—"

বাধা দিয়া শ্রীপতি বলিলেন, "বেশ ত মা! তার জন্তে আপনি এত কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন? কি আছে নিয়ে আসুন, খাচ্ছি। ক্ষিদেও ত পেয়েছে। কিন্তু আপ্‌নি আমাকে এমন "আপ্‌নি" "আপ্‌নি" বল্‌ছেন্ কেন? তা পাবেন না। আমি যখন আপ্‌নার ছেলের মতন, তখন আমাকে 'তুমি' বল্লেই ভাল শুনায়। তাই বল্‌বেন্।"

শ্রীপতির সৌম্য মূর্ত্তি, আমায়িক ভাব, এবং কথাবার্ত্তা শুনিয়া রমণীর অন্তরের সমস্ত সঙ্কোচ তিরোহিত হইয়া, তাঁহার প্রতি কেমন একটা বাৎসল্য ভাব জন্মিতে লাগিল! কমলের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "কমল, দেখ ত মা, কি আছে? দু'টী রান্না চড়িয়ে দাও।" কমল মাতার আদেশমাত্র উঠিয়া গিয়া ক্ষিপ্রহস্তে উনুন ধরাইয়া খেচরান্নের ব্যবস্থা করিতে লাগিল। বাহিরে দাওয়ার এক পার্শ্বে খানিকটা স্থান দরমা দিয়া ঘেরা ছিল; সেইখানেই তাঁহাদের রন্ধন-কার্য্য চলিত। কমল অচিরাৎ রন্ধন শেষ করিয়া, ঘরের ভিতর শ্রীপতির আহারের স্থান করিয়া দিল।

আহার করিতে বসিয়া শ্রীপতি রন্ধন-কর্ত্রী কমলের রন্ধনের যথার্থই বিশেষ প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না; বলিলেন, "আপনার মেয়েটি ত ঠিক্ অন্নপূর্ণা! কি সুন্দর রেঁধেছে!" তাহার পর কমলের দিকে চাহিয়া সহাস্যে বলিলেন, "এবার রান্নার জন্তে তোমাকে একটা ভাল প্রাইজ দিতে হবে" ইত্যাদি।

বৃষ্টির বেগ ক্রমে ঈষৎ প্রশমিত হইল; কিন্তু অন্ধকার গভীর রজনীতে গ্রাম্য-পথে একাকী পদব্রজে বাটী যাওয়া যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত না হওয়ায়, শ্রীপতি বিধবার একান্ত অনুরোধে আহারাদি করিয়া চৌকির উপর সেই সামান্য শয্যাতেই তুষ্ট হইয়া শয়ন করিলেন। একখানি ভিন্ন আর খাট ছিল না; সুতরাং বিধবা কমলকে লইয়া সেই কুটীরের অন্তপ্রান্তে শয়ন করিলেন। শ্রীপতির নিদ্রা হইল না। শয়ন করিয়াও কত কি গল্প করিতে লাগিলেন। হঠাৎ শ্রীপতি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা, আপনাদের কি এই আদি-নিবাস?"

বিধবা ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন, "না, আমাদের আদিনিবাস ছিল দেবীপুরে। দৈবদুর্ঘটনা-বশতঃ আমাদের সব গিয়েছে, তাই এখানে বাস করছি।" শ্রীপতি বলিলেন, "ওঃ দেবীপুরে! দেবীপুরে আমার মামার বাড়ী। রামনিধি চৌধুরীকে জানেন্ কি? তিনি আমার মাতামহ।"

বিধবা যেন কেমন শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি শ্রীপতির কথার কোন উত্তর না দিয়া অন্য কথা উত্থাপন করিলেন। তিনি তাঁহাদের প্রকৃত পরিচয় না দিলেও কথায় কথায় শ্রীপতি তাঁহাদের অনেক কথাই জানিয়া লইলেন। কথায় কথায় বিধবা এ ইচ্ছাটুকুও প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন যে, কমলকে একটী সৎপাত্রের হস্তে ন্যস্ত করিয়া তিনি কাশীবাসিনী হইতে ইচ্ছা করেন; কিন্তু

গরিবের মেয়ে কেহ সহজে বিবাহ করিতে চাহে না বলিয়া মনের মত পাত্র এখনও জুটে নাই। তাই কমল এখনও অবিবাহিত! এবং যত্ন করিয়া কমলের জন্য সু-পাত্র অনুসন্ধান করিবে এমন আত্মীয়ও তাঁহার কেহ নাই।

শ্রীপতি শুনিয়া বলিলেন, "এমন রূপে গুণে লক্ষ্মীস্বরূপা মেয়ের সৎপাত্রের অভাব!"

বিধবা বলিলেন, "টাকা না পেলে ত কেউ বিয়ে কর্‌তে চায় না, বাবা!"

শ্রীপতি বলিলেন, 'আমার বন্ধুদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন, যাঁরা বিনা টাকায় এমন পত্নী লাভ কর্‌তে পেলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করবেন্। আচ্ছা, আমি আপনার কমলের জন্য পাত্র অনুসন্ধান ক'রে দোব। আপনার কোন ভাবনা নাই।'

( ২ )

উপরিউক্ত ঘটনার পর আরও আট মাস অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। শ্রীপতি আর আসেন্ নাই। তিনি যে কমলের জন্য পাত্র অনুসন্ধান করিয়া দিবেন বলিয়া বিধবার নিকটে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, বিধবা সেই আশায় আশ্বস্ত হইয়া পথ চাহিয়া থাকিতেন। প্রত্যেক অপরিচিত শব্দে তিনি চমকিয়া উঠিতেন, 'ঐ বুঝি শ্রীপতি আসিয়াছেন! ঐ বুঝি তিনি ডাকিতেছেন।' কতদিন তিনি ছুটিয়া গিয়া দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন, কিন্তু কই শ্রীপতি! শ্রীপতির কত কাজ! ধনাঢ্য ভূম্যধিকারী যুবকের আর কি এ দরিদ্র বিধবার কথা মনে আছে! কিন্তু বিধবা এখনও আশা একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। এমনই করিয়া আশা-নিরাশার ভিতর দিয়া, একমাস দুইমাস করিয়া আট মাস অতীত হইয়া গেল। শীতের পরে বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ চলিয়া গিয়া, হিমবিন্দু ও উত্তরে বাতাস সঙ্গে করিয়া হেমন্ত দেখা দিল। কমল দশম বর্ষ অতিক্রম করিয়া ত্রয়োদশে পদার্পণ করিয়াছে। যৌবনের চিহ্ন তাহার সকল দেহে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার দেহের লাবণ্য যেন আরও সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে। কন্যার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বিধবা আশঙ্কায় আকুল হইয়া উঠিতেছেন্। তিনি সহায়-সম্পত্তি-হীনা। একমাত্র ভগবান্ ভিন্ন এ জগতে তাঁহার বন্ধু কেহ ছিল না। তিনি আকুল প্রাণে তাঁহাকেই কেবল ডাকিতেন্। প্রাণের ব্যাকুলতার সহিত প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে ডাকিলে সে ডাকা কখনও নিষ্ফল হয় না। এ জগতে অসহায়ের একমাত্র সহায় ভগবান্।

একদিন অপরাহ্নে বিধবা দাবায় বসিয়া কমলের কেশ-বিন্যাস করিয়া দিতেছিলেন। বেণী বিনান শেষ হইয়াছে, খোঁপা বদ্ধ করিলেই হয়, এমন সময় দ্বারে কে করাঘাত করিল। বিধবা বলিলেন, "কমল, দেখ ত মা, কে কপাট ঠেল্‌ছে।"

কমল উঠিয়া কপাটের ফাঁক দিয়া দেখিয়া আসিয়া বলিল, "ও মা, সেই তিনি!"

মা বলিলেন "কে রে?"

"সেই যে তিনি! জমিদার বাবু!" কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই কমলের আকণ্ঠ রাঙা হইয়া উঠিল। বিধবা ব্যস্ত ভাবে বলিলেন, "কে? দে দে—শীগ্‌গির দোর খুলে দে।"

কমল কপাটটী খুলিয়া দিয়া একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল। তাহার পৃষ্ঠে বেণীটী দুলিতেছিল। অস্তগামী সূর্য্যের তির্য্যক্ ছটা

তাহার মুখের উপর পতিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শ্রী সম্পাদন করিল। শ্রীপতি প্রবেশ করিয়াই একবার সস্মিতনেত্রে কমলের মুখের দিকে চাহিলেন, অমনি চারি চক্ষুর সম্মিলন হইল। লজ্জায় কমল মস্তক নত করিল। কমলের মাতা অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "এস বাবা! কমল, একখানা আসন পেতে দে ত মা!"

কমল তড়িতের ন্যায় নীরবে জননীর আদেশ পালন করিল। শ্রীপতি দাওয়ার উপর উঠিয়া কমলের মাতাকে প্রণাম করিয়া আসনে বসিয়া সহাস্যে বলিলেন, "আপনি হয় তো মনে কচ্ছেন্, আমি আপনাদের কথা ভুলে গেছি, কিন্তু তা নয়, মা! আমি এতদিন আস্‌তে পারি নি। আশা করি, আপনি এর জন্যে আমাকে ক্ষমা করবেন।"

শ্রীপতির কথায় প্রীত হইয়া বিধবা বলিলেন "কোথায় গেছ্‌লে বাবা? শরীর বেশ ভাল আছে ত?"

শ্রীপতি বলিলেন "হ্যাঁ। শরীর ভালই আছে। সেই যে ঝড়বৃষ্টির পরদিন সকাল বেলায় আপনার এখান থেকে যাই, গিয়েই শুন্‌লুম্, রামনগরে আমাদের যে জমীদারি আছে, সেখানে দুর্ভিক্ষ আর সঙ্গেসঙ্গে কলেরা প্রভৃতি সংক্রামক রোগ সব দেখা দিয়েছে। সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসীই সাধারণ গৃহস্থ আর দরিদ্র কৃষক। সংক্রামক রোগের হাত থেকে কেমন ক'রে আত্মরক্ষা করতে হয়, তা তারা মোটেই জানে না। আর অবস্থার অস্বচ্ছলতা-হেতু ঔষধ-পথ্যের অভাবে টপ্‌টপ্ লোক মারা পড়্‌ছে। শুনে ত' আর চুপ করে থাক্‌তে পারলুম্ না। সেই দিনেই আমি জনকতক লোক আর সহকারী দু'জন ডাক্তার নিয়ে সেখানে চলে গেলুম। গিয়ে তাদের যে রকম অবস্থা দেখলুম তা আর আপ্‌নাকে কি বল্‌ব? তা দেখ্‌লে পাষাণেরও প্রাণ ফেটে যায়! না পাচ্ছে খেতে, না পাচ্ছে একটু ওষুধ। কাজে কাজেই মারা পড়্‌ছে। তার উপর দেশে অত্যন্ত জলকষ্ট। সে গ্রামে নদী টদী নেই, পুকুর টুকুর লোকের যা আছে, তা বহুদিন সংস্কারাভাবে কা'রো জল শুকিয়ে গেছে, কোনটা বা পানায় ভরে গেছে, আবার কোন পুখুরের জল এমন বিশ্রী পচে গেছে যে, তার দুর্গন্ধে কাছে দাঁড়ান যায় না। সেই সব জল লোকে ব্যবহার কচ্ছে, খাচ্ছে। সেইজন্যে ব্যায়রাম না কমে আরও বরং বৃদ্ধি হচ্ছে। তাদের চিকিৎসা করে, ঔষধ পথ্য দিয়ে, তাদের আরাম করে তুল্‌তে, তাদের চাষ-আবাদের জন্যে একটা বন্দোবস্ত করে দিয়ে, দুই একটা পুখুর কাটিয়ে —এই সব বন্দোবস্ত কর্‌তে কর্‌তে এত দিন দেরি হয়ে গেল। জানেন্ ত, নিজে না থাক্‌লে পরে, শুধু লোক-জনের দ্বারায় কোন কাজই হয় না। সবে কাল এখানে এসে পৌঁছেছি। এসেই আপনার সঙ্গে আজ দেখা কর্‌তে এলুম্।" কিছুক্ষণ এ-কথা সে-কথার পর বিধবা বলিলেন "চেয়ে দেখ বাবা, কমল কত বড় হয়ে উঠেছে! আর ত' ওকে আইবড় রাখা যায় না।"

শ্রীপতি মুহূর্ত্তের জন্য কমলের দিকে চাহিয়া মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। বিধবা আবার কিছু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "তুমি যে বাবা, বলেছিলে কমলের জন্য পাত্রের অনুসন্ধান করবে, তার কিছু হয়েছে কি?"

শ্রীপতি কি উত্তর দিবেন প্রথমে তাহা ভাবিয়াই পাইলেন না। ক্ষণেক নীরবে থাকিয়া বলিলেন, "দেখুন্ মা, কমলের যোগ্য সুপাত্র আমি ত' কোথাও দেখ্‌তে পেলাম্ না।" এই কথা শুনিয়া বিধবার এত দিনের সঞ্চিত আশা মুহূর্ত্ত-মধ্যে নিরাশায় পরিণত হইল; তাঁহার বক্ষঃ ভেদ করিয়া একটা গভীর দীর্ঘ-নিঃশ্বাস বহির্গত হইয়া গেল। শ্রীপতি আবার কিছু ইতস্ততঃ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে, তা হ'লে আপনার কমলকে আমায় দান করুন্।"

কথাটা শুনিয়া বিধবা হঠাৎ বিশ্বাস করিতে পারিলেন না; ভাবিলেন, তাঁহার শুনিবার ভ্রমই হইয়াছে। তাই বলিলেন, "কি বল্‌ছ বাবা?"

শ্রীপতি সলজ্জে নতমস্তকে পুনর্ব্বার ধীরে ধীরে বলিলেন, "আপনি যদি আমাকে কমলের নিতান্ত অযোগ্য মনে না করেন্, তা হ'লে আপনার কমলকে আমায় দান করুন্।"

বিধবা বুঝিলেন, এবার আর তাঁহার ভ্রান্তি নহে। কিন্তু তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "বাছা, তোমার মতন জামাতা লাভ করা পরম সৌভাগ্য, তা'তে সন্দেহ নাই। কিন্তু এখন আর আমার সে অবস্থা নেই যে, তোমাকে জামাই কর্‌বার স্পর্দ্ধা রাখ্‌বো! কমল এখন দরিদ্র বিধবার মেয়ে, কোনও সচ্চরিত্র দরিদ্র যুবকের হাতে তাকে দিতে পার্‌লেই আমি নিশ্চিন্ত হই।"

শ্রীপতি বলিলেন, "মা, আপনি বৃথা চিন্তা কর্‌ছেন। ভগবানের কৃপায় আমার টাকার অভাব নেই, আর অর্থ- বা সম্পত্তি-লালসায় বিয়ে করার আমি পক্ষপাতী নই। আর তা আমি কর্‌বোও না। সুতরাং আপনি যে চিন্তা কর্‌ছেন, সে চিন্তার কোনও প্রয়োজন নেই।"

বিধবা বলিলেন, "কিন্তু তোমার অভিভাবকেরা এতে সম্মত হবেন্ কেন, বাবা! গরীবের—"

বাধা দিয়া শ্রীপতি বলিলেন, "একমাত্র মা ভিন্ন এ জগতে অপর অভিভাবক আমার আর কেউ নেই।"

বিধবা। তবে তোমার মায়ের অনুমতি নেওয়া আগে দরকার। নইলে শেষে তিনি গরিবের মেয়ে দেখে অসন্তুষ্ট হবেন; তুমিও মনে দুঃখ পাবে।

মৃদু হাসিয়া শ্রীপতি বলিলেন, "আপনার এ চিন্তাও অমূলক। আমার মা সে রকম প্রকৃতির নন্। আমার কাজে কখনও তিনি কোন বাধা দেন্ নাই। সন্তানের প্রতি তাঁর এত বিশ্বাস যে, কখনও তাঁহাকে পুত্রের কাজে দুঃখ করিতে হয় না। তাঁর পূর্ণ সম্মতি নিয়েই এসেছি।" ক্ষণেক উভয়েই নীরব। তার পর শ্রীপতি আবার বলিলেন "আমি একদিন আপনার কমলকে দেখেই চিনেছি, আপনার কমল সামান্য রমণী নয়।—সে রত্ন। এ রত্ন যে কণ্ঠে পর্‌বে সে পরমভাগ্যবান্। তবে যদি আমার সঙ্গে বিবাহ দিতে আপনার আপত্তি ও প্রতিবন্ধক থাকে, আমি অবশ্য জোর কর্‌তে পারি না।"

এবার অশ্রু-বিক্ষুব্ধস্বরে বিধবা বলিলেন, "আমার আপত্তি? আমি এখনও বিশ্বাস কর্‌তে পাচ্ছি না, তুমি এ-কথা সত্যই আমাকে বল্‌ছ, কি আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছি!

এবার শ্রীপতি হাসিয়া ফেলিলেন ; বলিলেন, "অবিশ্বাসের কোনও কারণ নেই ত মা ! এই আমি আদৎ মানুষটা আপনার সামনে বসে রয়েছি। তা হ'লে একবার আপনাদের পুরোহিতকে ডাকুন্, দিনটা স্থির হয়ে যাক্ !"

বিধবা আর কিছু বলিলেন্ না ; ধীরে ধীরে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। নিকটেই দামোদর শর্ম্মার বাটী। পলাশ-পুর গ্রামের মধ্যে তিনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত এবং বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত এবং ভদ্রসমাজেও বিশেষ সম্মানিত। লোকটি অতিনিরীহ। বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি ; কিন্তু শরীরে এখনও এতদূর সামর্থ্য যে অনায়াসে তিন চারি ক্রোশ পথ পদব্রজে গমনাগমন করিতে ক্লান্তিবোধ করেন না। বিধবাকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন্ এবং যথেষ্ট সম্মানও করিতেন্। বিধবা তাঁহার নিকটে যাইবামাত্র তিনি বিধবার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; এবং পাঁজি পুঁথি খুলিয়া বেশ করিয়া দেখিয়া শুনিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "কালকের দিন ব্যই ত আর বিয়ের দিন নেই ! সামনে পৌষ মাস পড়্‌বে, তার পর অকাল !"

শ্রীপতি বলিলেন, "বেশ, তা হ'লে কালকেই বিবাহের বন্দোবস্ত করুন্।"

বিধবা একবার শ্রীপতি এবং একবার দামোদর শর্ম্মার মুখের দিকে চাহিলেন। মাথা নাড়িয়া দামোদর শর্ম্মা বলিলেন, "তা কি করে হয়ে উঠ্‌বে ! পার্‌বে কি মা, কালকের মধ্যে সব উদ্যুগ কর্‌তে ?" এই বলিয়া তিনি বিধবার দিকে চাহিলেন। শ্রীপতি বলিলেন, "উদ্যোগ আর কি ? অনর্থক টাকা খরচ কর্‌বার কোন প্রয়োজন নেই ! কেবল বিবাহে কি কি লাগ্‌বে সেইগুলো আপনি ঠিক্ করে রাখ্‌বেন্। আর এ-মাসে দিন যখন নেই, তখন কালই এ বিবাহ সম্পন্ন করা আবশ্যক। বিলম্বে নানা প্রকার বিঘ্ন ঘট্‌তে পারে।"

বিধবারও সেই অভিপ্রায়। বিশেষতঃ বিবাহে শ্রীপতির আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া তিনিও মনে মনে প্রীত হইলেন। কমলকে এই দেবদুর্লভ স্বামীর হস্তে অর্পণ করিয়া সংসার হইতে নিষ্কৃতি-লাভের বাসনা মনে মনে তাঁহারও প্রবলতর হইয়া উঠিয়াছিল। তাই তিনিও শ্রীপতির কথার সমর্থন করিলেন। অগত্যা দামোদর শর্ম্মাও আগামী কল্য উভয়ের বিবাহ দিতে সম্মত হইয়া প্রস্থান করিলেন। শ্রীপতিও বিধবাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। ভুলো কুকুরটা তাঁহার পায়ের কাছে ঘুরিয়া ফিরিয়া যেন কৃতজ্ঞতা জানাইতে লাগিল। শ্রীপতি তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া, আদর করিয়া আর একবার সপ্রেম দৃষ্টিতে কমলের দিকে চাহিয়া স্মিত-মুখে সাইকেল আরোহণে দ্রুত প্রস্থান করিলেন।

পরদিন গোধুলি-লগ্নে বিনা আড়ম্বরে ধনাঢ্য যুবক জমিদার শ্রীপতিমোহনের সহিত দরিদ্রা বালিকা কমলরাণীর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র।

# শিব-প্রয়াণ।

শিবনাথ শিবপুরে করিল প্রয়াণ !
দেববালা পুষ্পবীথি করিয়া চয়ন
গাঁথিল মোহন মালা করিতে অর্পণ !
শিবধামে ভক্তপূজা হলো আয়োজন !

চন্দনের সুসৌরভে চর্চ্চিত বদন,
শ্বেত-শতদলস্রক্ শোভে গলদেশে !
কুসুম পল্লবে ঢাকা সুন্দর বিমানে
শিবনাথ শিবলোকে করিল গমন !

'দশদিক্ জাগাইয়া ব্রহ্মনাম-গানে',
কাঁদিছে ভকতবৃন্দ শোকার্ত্ত পরাণে—
'ছেড়ে গেল বিশ্বভরা পুত্রকন্যাগণে !'—
প্রকৃতি মলিনমুখী হেরে সে বয়ানে !

বঙ্গনারী কাঁদে আজি করুণ হৃদয়ে
বিসর্জ্জিয়ে শুভাকাঙ্ক্ষী উন্নতি-সাধকে !
অবলা বালার তরে দীপ জ্বালাইয়ে
কে যাবে লইয়ে আর আলো দেখাইয়ে !

নারীর সম্মান তরে কা'র ব্যাকুলতা
দেশে দেশে জাগাইবে উৎসাহ উদ্যম ?—
ভারতে আবার সেই আর্য্য-সুসভ্যতা,
নরনারী-ভেদাভেদে দিবে স্বাধীনতা ?—

"শিবনাথ" মহাযোগী ত্যজিয়া সংসার
আনন্দে অমরধামে করিতে বিশ্রাম
ধরণীর কাছে হায় ল'য়ে অবসর
অনন্ত শান্তির ক্রোড়ে লভিছে আরাম !

ধার্ম্মিক নির্ভীক-চিত দৃঢ় কর্ম্মবীর,
বিশ্বাসে অটল সদা বিনম্র সুধীর,
সাহিত্য আকাশে রবি আলোক-মণ্ডিত,
কবিতা-কাননে পিক বসন্ত-শোভিত !

বঙ্গের উজ্জ্বল দীপ নিভে গেল হায় !
এই ক্ষতি কে পূরাবে নব মহিমায় !
মহত্তের মহাকীর্ত্তি ঘোষিয়া ধরায়,
শিবনাথ স্মৃতিপূজা কর গো ত্বরায়।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

---

# আমাদের শাস্ত্রিমহাশয়।

( পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পরলোক গমনে )

আমি বাল্যকালে "নির্ব্বাসিতের বিলাপ" পড়িতাম। "পড়িতাম" অর্থে 'স্কুলে' নহে। চাঁদের শুভ্র জ্যোৎস্না দেখিলে মন যেমন স্নিগ্ধ ও মুগ্ধ হয়, নবস্ফুট ফুলের বিমল ছটা দেখিলে মন যেমন স্নিগ্ধ ও মুগ্ধ হয়, নদীর তরঙ্গায়িত সুনীল জলরাশি দেখিলে মন যেমন স্নিগ্ধ ও মুগ্ধ হয়, নির্ব্বাসিতের বিলাপ পড়িতে পড়িতে আমার মন তেমনি স্নিগ্ধ, তেমনি মুগ্ধ হইয়া পড়িত। তাই আমি একটু অবসর পাইলেই উহা পড়িতে বসিতাম। তাই ঐ গ্রন্থ যখন পড়িতে বসিতাম, তখন ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে যাউক্ গুরুজনদিগের আদেশপূর্ণ আহ্বান পর্য্যন্ত

আমার কানে যাইত না। তখন গ্রন্থে গ্রন্থকারের নাম ছিল না। তাই অমন মধুর অমন হৃদয়গ্রাহী কাব্যের কবিকে জানিবার জন্য আমার মন বড়ই আকুল হইত। যদিও সে আকাঙ্ক্ষা তখন পূর্ণ হয় নাই, তথাপি পুনঃপুনঃ ঐ গ্রন্থ পড়িয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতাম না। তাহারপরে কত সাময়িক পত্রে "শ্রী শিঃ—" স্বাক্ষরিত কত সুমধুর কবিতা পড়িতাম, লেখকের সম্পূর্ণ নাম জানিতাম না। ক্রমে ক্রমে "মেজবৌ, পুষ্পমালা" প্রভৃতি পড়িলাম। শেষে জানিলাম 'নির্ব্বাসিতের বিলাপে'র গ্রন্থকার, সাময়িক পত্রের কবি "শ্রী শিঃ—"মেজবৌ, পুষ্পমালা প্রভৃতির লেখক আমাদের দেশের একজন পরমধার্ম্মিক, সুপ্রসিদ্ধ বিদ্বান্ অদ্বিতীয় বাগ্মী, প্রকৃত কর্ম্মযোগী, উদারচেতা, বঙ্গ-মহিলাগণের হিতৈষী বন্ধু, সদাশয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী। আমি নির্ব্বাসিতের বিলাপ পড়িয়া বাল্যকাল হইতে সুকবি ও সহৃদয় ব্যক্তি ভাবিয়া যাঁহাকে মনে মনে পূজা করিয়া আসিতেছিলাম, তাঁহার পরিচয় জানিয়া, তাঁহাকে বহুবিধ সদ্গুণান্বিত সাধু জানিয়া আমার প্রাণ পুলকিত হইল। আমি যেন কৃতার্থ হইলাম। আবার যখন শুনিলাম, তিনি নিজ ভক্তি ও বিশ্বাসানুমোদিত ধর্ম্মে আত্মসমর্পণ-জন্য একান্ত ভক্তিভাজন মাতাপিতা-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছেন, যখন শুনিলাম তাঁহার মাতৃজাতির প্রতি তিনি এত অনুকূল এত শ্রদ্ধাবান্ যে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য তিনি সর্ব্বতোভাবে যত্ন ও চেষ্টা করেন, যখন শুনিলাম সেই শুদ্ধচেতা জিতেন্দ্রিয় জগতের ঘৃণ্য পতিতা কুলটাদিগকেও দয়া করিয়া সৎপথে আনিবার সহায়তা করিতে পারেন, তখন এই দূরে থাকিয়াই তাঁহার চরণে মনে মনে শত সহস্র প্রণাম করিয়াছি। আর ভাবিয়াছি, তাঁহার মত যিনি নরদেবতা, তিনি হিন্দু হউন্, ব্রাহ্ম হউন্, খ্রীষ্টান হউন্, আর মুসলমান হউন্, তিনি সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে সকলেরই নমস্য। তাঁহার আবির্ভাবে মাতৃভূমি কৃতার্থা ও পবিত্রা হইয়া থাকেন্।

হায়! আমাদের সেই শাস্ত্রিমহাশয় আর এ জগতে নাই! যিনি ধর্ম্মের জন্য, দেশের জন্য দারিদ্রতা সাধিয়া লইয়াছিলেন, পরোপকার যিনি জীবনের ব্রত করিয়াছিলেন, যাঁহার বন্ধুত্বে পরম শত্রুও মুগ্ধ হইয়া রহিত, যিনি বাঙ্গালি জাতির গৌরব, মহিলা-কুলের বিশ্বস্ত সুহৃদ্, মাতৃভূমির অলঙ্কার, আমাদের সেই শাস্ত্রিমহাশয় আর নাই! তাঁহার গৃহ আঁধার করিয়া পতিব্রতা পত্নীর বুকে শোকের আগুন জ্বালিয়া, স্নেহের পুতলী সন্তান-সন্ততিদিগকে জনমের মত কাঁদাইয়া, আমাদের দেশকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া তিনি তাঁহার মায়ের কোলে চলিয়া গিয়াছেন! তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে কাহারও সাধ্য হইল না! মায়ের ডাক শুনিয়া মায়ের ছেলে মায়ের কোলে চলিয়া গেলেন! তখন মধ্যাহ্ন-সূর্য্য সহসা নিভিয়া যাইতেছিল, শরতের বাতাস "হায়! হায়" করিতেছিল, বিহঙ্গম-কণ্ঠ যেন আর্দ্র হইতেছিল, জনতা-কোলাহল-পূর্ণা কলিকাতা-নগরী যেন অজানা, আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়াছিল! শাস্ত্রিমহাশয়ের "থাটি থাক" কবিতা সেই দিন বামাবোধিনী-পত্রিকা-শীর্ষে প্রকাশিত হইয়া পাঠক-

পাঠিকার মনকে উদাস করিয়া তুলিয়াছিল! সেই ১৩২৬ বঙ্গাব্দের ১৩ই আশ্বিন মঙ্গবারে, হিন্দুগৃহে দুর্গা-ষষ্ঠীর পুণ্য দিনে আমাদের পুণ্যময় শাস্ত্রিমহাশয় আমাদিগকে এ-জনমের মত ছাড়িয়া গেলেন! দিনের পর দিন আসিবে, বিশ্বজগৎ যেমন ছিল তেমনি থাকিবে, পৃথিবী আবার মেরুদণ্ডে ঘুরিবে, কিন্তু হায়, আমাদের শাস্ত্রিমহাশয় আর আসিবেন্ না। তাঁহার অমৃত মাখা কথা এ জগৎ আর শুনিবে না! তিনি নাই!

তিনি নাই, তবু ও তিনি আছেন; তিনি আমাদের দেশ-জননীর অনেক অভাব মোচন করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহার কর্ম্মের মধ্যে, মাতৃভূমির বুকের মধ্যে, বাঙ্গালির প্রাণের মধ্যে দেবতার মত তিনি আছেন এবং থাকিবেন। সেই অক্লান্তকর্ম্মা নির্ভীক বীরকে মৃত্যু কখনই স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি আনন্দময়ী মায়ের বরপুত্র; তিনি সূর্য্যদেবের মত কর্ম্মাবসানে শান্তিলাভ করিতে আনন্দের হাসি হাসিতে হাসিতে মায়ের কোলে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জন্য আমাদের ভয়েরও কিছু নাই, ভাবনারও কিছু নাই। তবে আমরা যে তাঁহাকে হারাইলাম, তাঁহার শূন্য আসন পূর্ণ করিবার মত আর যে কাহাকেও দেখিতেছি না,—তাঁহার অভাব যে কত যুগে পূর্ণ হইবে না, সেই কথা ভাবিতেছি আর বুক ফাটিয়া যাইতেছে! আমরা মানব, আমরা স্বার্থপর।

লেখিকা

শ্রীমা—

---

# শিবনাথ।*

চিনি নাই, জানি নাই, শুনেছিনু শুধু
আলো করি' ছিলে ভিন্ন পথ,—
'নবীন' কিরণ মাখা যেন ভিন্ন গ্রহ,
'পুরাতন' আমাদের নহ যেন কেহ!
দূর হ'তে দেখিতাম্ চেয়ে তব রথ।

নিজের জগৎ ল'য়ে থাকিতাম্ পড়ি',
দেখিতাম্ গ্রহদলে তা'র;
তাদেরই কিরণ মেখে বেড়াতাম্ ছুটে,
নমিতাম্ নতশিরে বদ্ধ করপুটে;
নাহি ছিল অবসর তোমার চিন্তার।

সুবিমল সমুজ্জ্বল তোমার মূরতি
মাঝে মাঝে পড়িয়া নয়নে
করিত পলকহীন! কি সৌম্য সুন্দর!
কিন্তু ভিন্ন পথে তুমি যেতে নিরন্তর,
ফিরায়ে লইতে হ'ত তখনি বদনে।

শুনিতাম্ জিজ্ঞাসিয়া তোমার বারতা,—
তুমি নাকি ছিলে এ জগতে,
নূতনের আকর্ষণে পুরাতনে ভুলি'
গিয়াছিলে নাকি তুমি অন্য পথে চলি,'
আপনার বলিবার রাখ নি তোমাতে।

---

* সংস্কৃত কলেজে ইহার ভূতপূর্ব্ব ছাত্র পরলোকগত মহাত্মা ৺ শিবনাথ শাস্ত্রি-মহোদয়ের স্মৃতিসভায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস, শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য-প্রমুখ বক্তৃগণের মুখে ৺শাস্ত্রিমহোদয়ের সুপবিত্র চরিত-কথা শুনিয়া লেখকের মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহাই কবিতাকারে গ্রথিত হইয়াছে। লেঃ

সহসা হেরিনু এক আঁধারের ছায়া
　পড়িল এ জগত-উপরি।
　দেখি হেথা 'সত্য'-ভূমে সে আঁধার আসে,
　'ত্যাগের' জ্বলন্ত দীপ সে হাসি না হাসে,
　বিমল 'ভক্তি'র পথ সেই ছায়া ধরি'!
দেখিনু পড়ে সে ছায়া মলিন রেখায়
　হেথা ব্রহ্মতেজের আগারে,
　উদারতা, বিশ্বপ্রেম, চরিত্রের ভূমে
　আঁধার লইয়া যেন সেই ছায়া নামে!
　বুঝিনু সে মলিনতা অন্তর-মাঝারে।
কেন হেন বিপর্য্যয়? চাহিয়া বিস্ময়ে
　নেহারিনু অন্তগত তুমি।
　তাই কি আঁধার আসে মোদের জগতে?
　তবে কি মোদের তুমি পারোনি ত্যজিতে?
　এত আপনার তব ছিল এই ভূমি?
বুঝি নাই, বুঝি নাই, ভ্রান্তিবশে হায়!
　ওগো সাধু! মহিমা তোমার।
　হেথা বাহ্য অনুষ্ঠান যায় যাঁর পানে
　সেই ব্রহ্মে বেঁধেছিলে আপন পরাণে,
　অনুষ্ঠান ভাবি' শুধু বিঘ্ন সাধনার।
হেথাকার ব্রাহ্মণ্যের শ্রেষ্ঠ উপাদানে
　করেছিলে নিজেরে গঠন;
　ব্রহ্মতেজে হিয়া তব করি' আলোকিত
　স্বাধীন রাখিয়াছিলে করমে নিরত,
　ত্যাগ, সত্য জীবনের করিয়া ভূষণ।
হেথাকার ভক্তিনীর বিমল প্রবাহে
　বহি' যেত তোমার শিরায়;
　এ দেশের সংযমের কঠোর সাধনে
　ব্রতী রেখেছিলে মুনি! আপন জীবনে,
　আদরে লইয়াছিলে তুলি' দীনতায়।
এখানেরি অনাকাঙ্ক্ষা ধরিয়া যতনে
　রেখেছিলে পুষিয়া হৃদয়ে;
　সরলতা, বিশ্বপ্রেম লইয়া হেথার
　সাজায়ে রাখিয়াছিলে অন্তর তোমার,
　পূততার শুভ্রজ্যোতিঃ সতত ধরিয়ে।
বলিয়া গিয়াছ কবি! এখানেরি বাণী
　কি মধুর সরল গাথায়,—
　'আড়ম্বর ভ্রান্তপথে শুধু যায় ল'য়ে
　মহত্ব বাহিরে নহে, বিরাজে হৃদয়ে,
　অন্তর ভাসিত কর সত্যের আভায়।'
বুঝি নাই ভ্রান্তিবশে,—ছিলে তুমি জ্ঞানি!
　ব্রাহ্মণের সার ল'য়ে সাথে;
　নূতন আলোক নহে, নহে নব ভূমি!
　নাহি ছিলে আমা সবে পরিহরি' তুমি,
এখানেরি আলো ল'য়ে ছিলে এ জগতে।

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

---

# নিরুদ্দেশ।

( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর )

( ৪ )

অনেকদিন চলিয়া গিয়াছে। অবস্থা-বিপর্য্যয়ে সবাই পৃথক্ পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছেন। একদিন রাধানাথ রায় রামজীবন মুখুজ্যেকে বলিলেন, "তুমি ত দেনা শোধ করতে কিছুতেই পার না! তা তোমায় একটা পরামর্শ দিচ্ছি।—তোমার বাড়ীর

পার্শ্বের ঐ জমিটুকু আমাকে দাও, আমি তোমাকে সমস্ত দেনার, দায় হ'তে নিষ্কৃতি দিচ্ছি। আর তা হ'লে আমিও একটা পুকুর কাটাতে পারি।" রামজীবন মুখুজ্যে তাহার কথা শুনিয়া বলিলেন "ভাই, তুমি ঐ জমিটুকু কি ব'লে লইতে চাও? ওতে যাহোক্ শাকটা গাছপাতাটা বুনে অনেকটা সংসার-খরচ চলে যায়। আর বুঝ্‌তেই পার, একটা ছেলে কি সহজে মানুষ হয়? ওই ছেলে মানুষ করা এবং সংসার, দু'দিক্ চালাতে গিয়ে জমি জায়গা ত প্রায় সব বেচেছি; এর উপর যদি এইটুকু বেচে ফেলি, তবে যে ভাই না খেতে পেয়ে মর্‌ব! কৃষ্ণবিহারীবাবু তবু গরীবের উপর দয়া ক'রে ছেলেটীকে চারটী খেতে দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন; নচেৎ আমার মত লোক কি মানুষ কর্‌তে পার্‌ত? স্কুল-কলেজের মাইনে, কাপড় চোপড় বইএর খরচ যোগাইতেই আমি ফতুর হ'য়ে গিইছি। তবু বাছা কত কষ্ট ক'রে লেখা পড়া শিখ্‌ছে, তার আর কি বলি!"

রাধানাথ পরের দুঃখ-কষ্ট বড় বেশী বুঝিতেন না। রামজীবন মুখুজ্যের কাতর বচন বজ্রকেও বোধ হয়, দ্রবীভূত করিতে সমর্থ হইত, কিন্তু রাধানাথের বজ্র অপেক্ষাও কঠিন হৃদয় দ্রবীভূত করিতে তাহা সমর্থ হইল না। তিনি তাঁহার অভ্যস্ত স্বরে বলিলেন, "তা আমাকে দেবে কেন, দাদা? অন্য লোককে বিক্রী কর্‌তে পার, আমাকে দিলে তোমার জলে পড়্‌বে!" মনে মনে বলিলেন, "আচ্ছা, থাক বেটা! তুমি কতক্ষণ না দিয়ে থাক্‌তে পার, দেখি। তোমাকে এমন কৌশলে ফেল্‌ব, দেখ্‌তে পাবে মজা! তোমার ভিটে মাটী উৎসন্ন ক'রে ছাড়্‌ব। আমি মনে মনে ফন্দী আঁটছি।" তাহার পর রামজীবন মুখু-জ্যেকে ডাকিয়া তিনি পুনরায় বলিলেন, "ওহে মুখুজ্যে, ভাল কথাই বল্‌ছিলাম, তা তোমার ভাল লাগ্‌ল না। তা টাকাটা কবে দিচ্ছ বল দেখি নি? আমি রাখি কি করে বল দেখি নি? এখন আমার বড় টাকার দরকার পড়েছে। ওদিকে বড় মেয়েটাও সেয়ানা হ'য়ে উঠ্‌ল, তার ত আবার বিয়ে দিতে হবে?" কিন্তু মনে মনে তিনি ভাবিলেন, 'বড়মেয়েটাকে বিক্রয় করিয়া অন্ততঃ দুইশ টাকা নেবই নেব।' আবার বলিলেন, "যদি শীঘ্র না দাও, তবে বাধ্য হ'য়ে আমাকে আদালতের আশ্রয়-গ্রহণ কর্‌তে হবে। তোমার ত আর শুধ্‌বার দিন হবে না? তোমার ছেলে এণ্ট্রান্স পাশ কর্‌ল, তাকে চাকুরীতে একটা ঢুকিয়ে দিলেই ত পার্‌তে? তাহ'লে এতদিন আমার সাড়ে তিনশ, টাকা অনেক দিন শোধ হ'য়ে যেত? তুমি গরীব, তোমার আবার ছেলেকে এফ-এ, বি-এ, পাশ করান কেন? এতদিন একটা কলে টলে কিংবা সদাগরি আফিসে ঢুকিয়ে দিলে ত সে অনায়াসেই সংসারটা চালাতে পারত! আর হয়ত সে দু'চার পয়সা উপ্‌রি ও পেত; তা'তে দেনা শোধ হ'ত। ঐ দেখ না ওপাড়ার কৃষ্ণমিত্রের ছেলে রমানাথ মিত্র মাসে ২০৲ টাকা মাইনে পায়, কিন্তু তার উপ্‌রি পাওনা প্রায় ৫০৲ টাকা!"

রামজীবন শুনিয়া একটু শিহরিলেন,—রামজীবন মুখোজ্যের ছেলে চুরি করিবে? প্রকাশ্যে বলিলেন, "সে যখন হয় নাই, তখন ছেলেটার কি হয় দেখই না কেন ভাই?

তোমার টাকা সে নিশ্চয়ই শোধ্ করবে।" ইহা বলিয়া রামজীবন মুখুজ্যে আরও কিছু বলিতে চাহিতেছিলেন, কিন্তু রাধানাথ মাঝে হইতে বলিলেন, "নাও নাও, তোমার আর আশা দিতে হবে না। সে ১৫৲ টাকা বৃত্তি পায়, তাতেও দেনা শোধ হ'ল না, আবার চাকরী ক'রে, সংসার চালিয়ে আমার দেনা শোধ করবে! সে এখন অনেক জলের মাছ, দাদা, অনেক জলের মাছ! বি-এ, পাশ ক'রে পেটের ভাত করতে পারে কিনা দেখ, তারপর দেনাশোধ। যাক্, আগামী কল্য আমি কল্‌কাতায় যাচ্চি, চার্ পাঁচদিন সেখানে থাকব। যা, হয় একটা বন্দোবস্ত কোরো। আমি এসে যা হয়, একটা করব।

রামজীবনবাবু বলিলেন, "রমেন-সুনীলকেও একবার জিজ্ঞাসা কোরো, তারা কি বলে।" রাধানাথ বলিলেন, "হ্যাঁ, আমরা কাজ করব আবার দুধের ছেলেদের কাছে পরামর্শ নিয়ে। বুড়ো হয়ে তোমার সব বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পেয়েছে না কি?" এই বলিয়া রাধানাথ গম্ভীর ভাবে বাটীর দিকে চলিয়া গেলেন, রামজীবনও বাটীতে যাইলেন।

৫

দীর্ঘ পাঁচ ছয় বৎসর অতীত হইয়াছে, ইহার মধ্যে রমেন্দ্র, শান্তি, সুনীল কোথায় কি করিল, এবং রমেন্দ্র সুনীল কলেজে ভর্ত্তি হইবার পূর্ব্বে কোথায় ছিল, তাহা একটু বলা প্রয়োজন। রমেন্দ্র, সুনীল মাইনর পাশ করিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পরীক্ষার পূর্ব্বে জ্বররোগে আক্রান্ত হওয়ায়, পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিতে না পারায় সুনীল মাইনর পরীক্ষায় বৃত্তি পায় নাই। পাশ করিয়া রমেন্দ্র কলিকাতায় যাইয়া হিন্দুস্কুলে ভর্ত্তি হইল, শান্তিও দাদার সঙ্গে কলিকাতায় পড়িবে বলিয়া জিদ্ ধরায় অগত্যা তাহাকেও কলিকাতায় লইয়া গিয়া মহাকালী পাঠশালায় ভর্ত্তি করা হইল। কলিকাতায় কৃষ্ণবাবুর দুইখানি বাড়ী ভাড়া খাটিতেছিল; নোটিশ দিয়া একখানির ভাড়াটীয়াদিগকে উঠাইয়া দেওয়া হইল, এবং সেইখানে রমেন্দ্র, শান্তি এবং তাহাদের দূরসম্পর্কীয়া এক পিসীমা তাঁহার একটী পুত্রকে লইয়া তাহাদের সহিত থাকিলেন। সুনীলের পিতা সুনীলের কোনই উপায় করিতে পারিলেন না। এই সময় হইতেই কিছুকাল প্রকৃত বিচ্ছেদ হইল। রমেন্দ্র কলিকাতা যাইবার সময় সুনীলের নিকট অনেক কাঁদিল, সুনীলও কাঁদিল, কিন্তু উপায় কি? অবশেষে সুনীলকে তাঁহাদের বাসায় রাখিবার জন্য রমেন্দ্র মাতার নিকট অনুরোধ করিল। রমেন্দ্রের মাতা কৃষ্ণবাবুকে তাহা বলিলেন, কিন্তু তখন কৃষ্ণবাবু সম্মত হইলেন না। তাহার পর রমেন্দ্র ক্রমাগত মাতাকে পত্র লিখিতে লাগিল। ফলে, কৃষ্ণবাবু সম্মত হওয়ায় সুনীলও যাইয়া তাঁহাদের বাসায় রহিল; এবং একটি বিদ্যালয়ে অর্দ্ধ-বেতনে পড়িতে লাগিল। দুইজনেই একবাড়ীতে থাকে, কিন্তু দুইজনের চালচলন বিভিন্ন রকমের। একজন জমিদারপুত্র; তাহার ভয়ে দাসদাসী প্রভৃতি সদাই শঙ্কিত। আর একজন জমিদারপুত্রের বন্ধু হইলেও সামান্য দরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তান, জমিদারপুত্রের আশ্রিত—নগণ্য। যদিও বিদ্যায় তাঁহারা সমান, বরং রমেন্দ্র অপেক্ষা সুনীল অধিকতর সুনিপুণ।

সুনীল প্রতিবৎসর প্রথম হয় এবং সুন্দর সুন্দর পুস্তকাদি পুরস্কার পাইয়া থাকে, কিন্তু হিন্দু স্কুলে উচ্চস্থান অধিকার করা সহজসাধ্য নয়; এ জন্য রমেন্দ্র সকল বৎসর ভাল পারিতোষিক পায় না।

রমেন্দ্রের পাঠ্যাগার দ্বিতলের একটী সুন্দর প্রকোষ্ঠে। অপরাপর ঘরগুলির মধ্যে একটী ঘরে তাহাদের পিসীমা, তাঁহার পুত্রটী, এবং শান্তি শয়ন করে। অপর ঘরটীতে, কৃষ্ণবাবু যখন কলিকাতায় আসেন তখন থাকেন। কৃষ্ণবিহারী বাবু প্রায়ই সস্ত্রীক কলিকাতা আসিয়া থাকেন্। একেবারে বাড়ী ছাড়িয়া কলিকাতায় থাকিলে তাঁহাদের চলে না, এইজন্য তাঁহারা সকল সময় এখানে থাকিতে পারেন না। রমেন্দ্রের পড়িবার ঘরটী অতিশয় সুন্দর, চতুর্দ্দিক্ নানারূপ বহুমূল্য ছবিদ্বারা সুশোভিত। ঘরটী সর্ব্বদাই ঝক্ ঝক্ করিতেছে। সুনীল একতলায় একটী ঘরে থাকে; তাহার ঘরটী সে অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তিদ্বারা সাজাইয়াছে, অনেক সাধুলোকের প্রতিকৃতি দ্বারা সুশোভিত করিয়াছে। সে ঘরে ঢুকিলে বাস্তবিকই যেন নিজেকে পবিত্র বলিয়া মনে হয়। শান্তি মহাকালী পাঠশালায় পড়ে। সে অতিশয় বুদ্ধিমতী; অল্প সময়ের মধ্যেই কত সুন্দর সুন্দর সংস্কৃত বাঙ্গলা শ্লোক শিখিয়াছে—পূর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানে কত উন্নত হইয়াছে! তাহার শ্রেণীর সেই সর্ব্বোৎকৃষ্টা ছাত্রী ও সর্ব্বোত্তম পারিতোষিক, বৃত্তি প্রভৃতির অধিকারিণী। কিন্তু তাহার এই উন্নতির মূলে তাহার সুনীলদাদা। অবশ্য, ভগবৎপ্রদত্ত তাহার প্রখরবুদ্ধি একটী প্রধান সহায়। সুনীল তাহার পাঠে এরূপ সহায়তা করে, তাহার জ্ঞানার্জ্জনে এরূপ ব্যাকুলতা জন্মাইয়া দেয় যে, সে জ্ঞানে উন্নত না হইয়া পারে না। কিছুদিন পূর্ব্বে রমেন্দ্র তাহার ভগিনীর পাঠে সাহায্য করিবার জন্য অধিক সময় ব্যয় করিতে অনিচ্ছুক হওয়ায় তাহার পাঠে সাহায্য করিবার জন্য একটী শিক্ষক নিযুক্ত করিবার কথা হয়। কিন্তু রমেন্দ্রের পিসীমা, একটী অপর ব্যক্তি তাঁহাদের বাটী বসিয়া বসিয়া স্বকার্য্যসিদ্ধি করিবে এবং উপকারের মধ্যে তাঁহাদের কেবল অন্নধ্বংস করিবে, ইহা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেন না। এ-জন্য অবসর বুঝিয়া তিনি রমেন্দ্রের মাতাকে সুনীলের উপর ঐ ভার অর্পণের জন্য নানা ভাবে গুছাইয়া নানা উপদেশ দিলেন্। সুনীলকে এই কার্য্য গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিবামাত্র সে কিঞ্চিন্মাত্র প্রত্যুপকার করিবার অবকাশ পাইল ভাবিয়া, তাহাতে যারপর নাই প্রীতিলাভ করিল এবং শান্তি ও তাহার পিসীমাতার পুত্রের অধ্যাপনার ভার সানন্দে গ্রহণ করিল। শান্তি সুনীলের নিকট পড়া বলিয়া লয় এবং তাহাতে সে অত্যন্ত আনন্দ পায়। কারণ, সুনীলের বুঝাইবার অসাধারণ শক্তি, ও তাহার বয়সের অপেক্ষা তাহার জ্ঞানরাশি অধিক ছিল। বালিকা স্পষ্টই রমেন্দ্র অপেক্ষা সুনীলের শ্রেষ্ঠত্ব পদে পদে অনুভব করিত। সে কত ধর্ম্ম কথা, কত সুন্দর গল্প সুনীলের কাছে শুনে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। সুনীলের কথা শুনিয়া কখনও কখনও সে আনন্দে অথবা শোকে অশ্রু বিসর্জ্জন করে। কখনও কোন রাজপুত্র অথবা রাজকন্যা বিষম সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আবার স্বকীয় সিংহাসনে উপ-

বেশন করিলেন, শুনিয়া সে অতিশয় আনন্দিত হয়, আবার কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হইল শুনিয়া তাহার দুটী-নয়ন জলে ভরিয়া যায়। কখনও কখনও কোন রাজপুতবালার আশ্চর্য্য সতীত্বকাহিনী শ্রবণ করিয়া তাহার মনে এক ভীষণ তেজের উদ্দীপনা হয়, এবং তাহারও মনে হয় সেও যদি ঐরূপ অকৃত্রিম পরাকাষ্ঠা জীবনে দেখাইতে পারে তবে তাহার জীবন সার্থক হইবে। কিন্তু হায়, সরলা বালিকা জানিত না, কি ভীষণ জালে সে ক্রমশঃই জড়িত হইতেছিল! জ্ঞানস্পৃহার সহিত সুনী-লের সান্নিধ্যও তাহার যেন সর্বক্ষণ বাঞ্ছিত হইয়া পড়িতেছিল। শান্তি অনেক সময়ই সুনীলকে অকপটে নানাকথা জিজ্ঞাসা করিত, যাহা হয়ত, যাহাকে পর বলিয়া জানা থাকে, তাহার নিকট ব্যক্ত করা যায় না। কিন্তু সুনীলকে রমেন্দ্র এবং শান্তি কোনও দিনই পর ভাবিতে পারিত না। সুনীলের পিতা বাটী হইতে সুনীলের স্কুলের বেতন, কাপড়-চোপড়, পুস্তক প্রভৃতির জন্য যে টাকা পাঠাইতেন, তাহাতে কুলাইত না। সুনীল স্বমুখে তাহা ব্যক্ত না করিলেও দুইজন ব্যক্তি তাহার সকল অভাবই বুঝিতে পারিত। বিশেষতঃ শান্তি তাহার অভাব এরূপ বুঝিতে পারিত যে, নিজে যে টাকা পাইত তাহার দ্বারা সুনীলের অভাব-মোচনে ভ্রাতার সহিত পরামর্শ করিয়া বা সকলের অজ্ঞাতভাবে সাহায্য করিত। সুনীল এরূপ সাহায্য লইতে চাহিত না, কিন্তু তাহারা ছাড়িবার পাত্র নহে। ছলে বলে কৌশলে শান্তি সুনীলকে তাহার অজ্ঞাতসারে কৃতজ্ঞতার পাত্র করিত। রমেন্দ্রও বহু সময় স্বীয় সন্দেহ-স্থলগুলি সুনীলের নিকট লইয়া গিয়াছে এবং উভয়ের গভীর অভিনিবেশে সে সকল স্থান সুপরিস্ফুট হইলেও, রমেন্দ্র স্পষ্টই অনুভব করিত যে, সুনী-লের মেধাই সে সন্দেহ-ভঞ্জনের প্রধান কারণ। এজন্য সে সুনীলকে যেরূপ প্রগাঢ় ভালবাসিত, সেইরূপ মনে মনে তাহাকে যথেষ্ট ভক্তিও করিত। সে সুনীলকে তাহাদের একটি বহুমূল্য সমগ্রীর মধ্যে গণ্য করিত এবং ভগবান্ যে তাহাদিগকে এরূপ একজন সহায় দিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া আপনাদিগকে সৌভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করিত। এজন্য সেও প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে সুনীলের অভাব-মোচন করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিত। ক্রমে তাঁহারা এণ্ট্রান্স পাশ করিল। সুনীল ১৫৲ টাকা বৃত্তি পাইল, রমেন্দ্র পাইল ১০৲ টাকার।

এখন আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সেই সময় রমেন্দ্র ও সুনীলের বয়স প্রায় ঊনবিংশতিবৎসর এখন তাঁহারা এফ্‌ এ ক্লাসে দ্বিতীয়-বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেছে। শান্তির বয়স ত্রয়োদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হয় নাই।

রমেন্দ্র এবং শান্তি যে সুনীলকে এত ভালবাসিত, তাহাদের পিসীমা তাহা দেখিতে পারিতেন না। তিনি সামান্য কারণেই সুনীলকে উত্তম মধ্যম তিরস্কার করিতেন। উভয় ভ্রাতা ও ভগিনীরই প্রাণ তাহাতে ফাটিয়া যাইত। এইরূপ সুখদুঃখের মধ্যে মধ্যে সুনীল এত বড়টী হইয়াছে।

রমেন্দ্রের মাতার বহুকাল হইতেই অভিপ্রায় যে তিনি সুনীলের সহিত শান্তির বিবাহ দেন, কিন্তু কিছু বলিতে পারেন নাই। কারণ, গরীবের পুত্রের সহিত জমিদার-কন্যার বিবাহ কিরূপে হইতে পারে? কিন্তু

হইলেও হইতে পারে, এই ভাবিয়া তাহাদের মধ্যে কোন ব্যবধান রাখেন নাই, অধিকন্তু তাহাদের আনন্দে নিজেও অনেক সময় আনন্দ ভোগ করিতেন।

এই রকমে যখন সুখে দুঃখে দিন কাটিতেছে, এমন সময় একদিন রাধানাথ রায় কলিকাতায় আসিলেন এবং পূর্ব্বেকার ন্যায় রমেন্দ্রের বাটীতেই বাসস্থান লইলেন।

৬

রাধানাথ রায় পল্লীগ্রামের লোক। দরিদ্র-পুত্রের সহিত জমীদার-পুত্রীর এরূপ পরিচয় তিনি মোটেই পছন্দ করিলেন না। রমেন্দ্র, সুনীল ও শান্তির প্রণয় সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হইলেও তিনি তাহা দেখিয়া হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেলেন। তাহাদের পিসীমাও এ সমস্ত ত মোটেই দেখিতে পারিতেন না। কারণ, সুনীলকেই তিনি তাঁহার দুই চক্ষের বিষ দেখিতেন। সময় সময় এ বিষয় লইয়া কথা উত্থাপনা করিলেও রমেন্দ্র তাঁহার কথা মোটেই গ্রাহ্য করিত না। এখন রাধানাথকে পাইয়া পিসীমা সুযোগ পাইলেন এবং দুইজনে এই বিষয় লইয়া নানারূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।—

রাধানাথ। দেখ, মোহিনীদিদি, তোমাদের বাড়ীর কাণ্ড দেখে আর তোমাদের বাড়ী আস্‌তেও ইচ্ছা করে না, থাকা ত দূরের কথা। ছিঃ ছিঃ! তোমাদের কি একটুও আক্কেল নেই? বলি, শান্তি জমিদারের মেয়ে; বয়স প্রায় ১৩।১৪ বৎসর হ'তে চল্‌ল, আর সুনুলে গরীবের ছেলে; সে ছোঁড়ার সঙ্গে একজায়গায় বসে হাসি-তামাসা! তোমরা কি তা চোখেও দেখ্‌তে পাও না? আর রমেন্দ্র-বাবাজীও কি একেবারে লজ্জা-সরমের মাথা খেয়েছেন্? লেখা-পড়া না হয় শিখেইচে, তাই বলে কি আমাদের ঘাড়ে চড়ে বেড়াবে না কি? সুনুলে ও গরীবের ছেলে গরীবের মতই থাক্‌বে, বড়লোকের সঙ্গে মিশ্‌তে একটু লজ্জা করে না? তার উপর শান্তির তার সঙ্গে অত মেশামিশি কর্‌তে প্রাণে ভয় ও কি হয় না? কৃষ্ণবাবু শুন্‌লে একেবারে লেখাপড়া ঘুচিয়ে দেবেন্। এত কেন?

মোহিনী।—দাদা, তুমি ঠিক্ বলেছ। ও ছোঁড়াটা ঐ রকমই। আমি রমেন্‌কে এত বলি সেও বারণ করে না শান্তিকে। আর আমি যদি শান্তিকে বারণ করি সে উত্তর করে—"কেন? সুনীলদার কাছে যাই, তাতে তোমার অনিষ্ট হয় না কি? তুমি যেন তাকে দেখ্‌তে পার না, তা ব'লে তুমি মনে কর যেন কেউ ওকে না দেখ্‌তে পারে। সে আমার কত ভালবাসে, আমার কত উপকার করে, তা জান? আমাকে সে কত সুন্দর সুন্দর গল্প বলে।"

পিসীমাতা আরও একটু মাত্রা বাড়াইয়া বলিলেন, "আবার বলে কি জান? বলে, 'আমি যদি না যাই তবে সে রাগ কর্‌বে।' আমাদের ত হাঁড়ি চড়্‌বে না, সে রাগ কর্‌লে? কেমন দাদা তুমি কি বল?" রাধানাথ তাহাতে বলিয়া উঠিলেন, "ঠিক্ ঠিক্।" তখন মোহিনী পুনরায় আরম্ভ করিলেন, "আর বলেন্ কি, 'সুনীল-দার কাছে না পড়্‌লে আমার পড়া হয় না।' ঢং দেখে আর বাঁচি নে। আমি বল্‌লাম—'তবে সুনীলদাকে না হয় বিয়ে কর্। সে উত্তর দিলে কি জান?

'-ওগো অমন একজন বর পেলে তুমি ধন্যি হ'য়ে যেতে গো, তুমি ধন্যি হ'য়ে যেতে।' দেখেছ দাদা, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! কি বল্‌ব দাদা, সুখে দুঃখে আমাদের দিন একরম কাট্‌লেই হ'ল! বিধবামানুষ চারটে একবেলা একমুঠো খাই, আর ওদেরই সংসারধর্ম্ম দেখি। ছেলাটা এখানে থাকে, স্কুলে পড়ে, তাকে মানুষ কর্‌বার জন্যেই আমার এত অপমান সহ্য ক'রে থাকা। এ দুরদৃষ্টের কথা আর কি বল্‌ব!"

রাধানাথ।—তা দিদি, চুপ কর না। এবার বাড়ী গিয়ে যা হয় একটা কর্‌ব। ছোঁড়াটাকে তাড়িয়ে তবে আমার আর কাজ। দেখি, কেমন করে লেখা-পড়া শেখে, আর কেমন ক'রেই বা কি করে। এই শ্রাবণ মাসের আজ ২০শে, আশ্বিন মাসের পূজার বন্ধের পর বাছাধনকে আর কৃষ্ণবিহারী-বাবুর বাড়ী পদার্পণ ক'র্‌তে হবে না। তবে কৃষ্ণবিহারীবাবুর স্ত্রী ছোঁড়াটাকে বড় ভাল-বাসেন, নচেৎ যেমন বল্‌তাম অমনি হ'য়ে যেত। এখন একটু দেরী হ'লেও হ'তে পারে। তবে বাছাধনকে যদি কৃষ্ণবাবুর বাড়ী থেকে না তাড়াতে পারি, তবে আমার নাম রাধানাথই নয়। জান্‌লে দিদি! কি আর দুঃখের কথা বলি, রামজীবন মুখুজ্যের ত সর্ব্বস্ব গিয়েছে। বাড়ীর পাশে এক টুক্‌রা জমি আছে, সেইটে আমি চাইলাম; বল্‌-লাম, 'যা-দাম হয় তার চেয়ে কিছু বেশী দিতেও রাজী আছি। ওখানে একটা পুকুর কাটাতে ইচ্ছা আছে। তা হ'লে তোমারও উপকার হবে, পাড়াপ্রতিবাসীরও হবে, আমারও হবে।' বেটা বল্‌লে কি না, 'আমি প্রাণ থাক্‌তেও ও-জমিটা ছেড়ে দেব না।' বাড়ী গিয়েই আমার নিকট তার যে দেনা আছে, তার দরুণ নালিশ কর্‌ব, ডিক্রী চড়াব, দেখি, ছেড়ে দিতে হয় কিনা? আর দিদি, আমি এত জিদ্‌ ক'রে বল্‌চি, দেশে যে কলেরা রোগের আরম্ভ হ'য়েছে, তাতে কার কি হয়, দেখ। তবে জেলে-পাড়ায় কুমোর-পাড়ায় বেশী আরম্ভ হয়েছে। তবে তারা রক্ষেকালী পূজাও ক'রেচে; শীঘ্র থেমে গেল বলে। আমাদের পাড়ায় বাড়ী গিয়ে একটা পূজার বন্দোবস্ত কর্‌তে হবে। ইতোমধ্যে আমাদের পাড়ায় না হ'লেই বাঁচি!

এইরূপ কথা, গ্রামের আরও অন্যান্য কথা, কে কোথায় কি করিয়াছে, সমাজে কাহাকে একঘরে করা হইয়েছে, কে মস্ত একটা ভোজ দিয়াছিল বলিয়া তাহাকে সমাজে তুলিয়া লওয়া হইয়াছে, এইরূপ অনেক কথাবার্ত্তার পর রাধানাথ বলিলেন, "তবে দিদি, একটু বেড়িয়ে আসি। আজ দুদিন এখানে থাক্‌লাম, আরও দিন ২।৩ থেকে কতগুলো জিনিসপত্র কিনে নিয়ে বাড়ী যাব। আর ভাই একলা কতই বা পেরে উঠি। গিন্নী বছর বছর একটী ক'রে কন্যা প্রসব কর্‌তে আরম্ভ করেচেন, তাতেই পেটের ভাত চাল হ'য়ে যাচ্ছে। এখন কোন রকমে দু-পয়সা বাইরে থেকে আন্‌তে না পার্‌লে, যে কাল পড়েছে তাতে মেয়ের বিয়ে দেওয়াই ভার হবে। তাই দু-পয়সা টেনে টুনে আন্‌বার চেষ্টা করি, তা লোকের সহ্য হয় না। বদ্‌-মায়েস্‌ লোকগুলো আমার নামে কুৎসা রটনা করেচে—আমি নাকি সুদখোর নরপিশাচ।" এইবলিয়া রাধানাথ উঠিলেন।

মোহিনী কহিলেন, "দাদা, নানালোকে নানা কথা ব'লেই থাকে, সবভাতে কান দিতে গেলে আর চলে না। ও-সব তুমি গ্রাহ্যি করো না। তা বেড়াতে যাবে, একটু জলটল খেয়ে যাও না।" এই বলিয়া মোহিনী কিছু খাবার ও জল আনিয়া দিলেন। রাধানাথ খাবার খাইয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন।

(ক্রমশঃ)

---

# গোধূলি তারা।

কত বর্ষ কত যুগ যাইতেছে চ'লি,
কেন তুমি তৃপ্তি-হীনা অমর-কুমারি!—
নির্ম্মল সায়াহ্ন-নভে কা'র প্রতীক্ষায়
কা'র তরে চেয়ে থাক বল ত সুন্দরি!

প্রীতিভরা হৃদিখানি, স্মৃতিভরা আঁখি!
আপনা হারায়ে কেন নিতি সাঁঝ-বেলা
ঐই দেশে ঐইখানে কি মিলন-আশে
অনাদি অনন্ত হ'তে চেয়ে আছ বালা?

সোনার কমল-সম প্রস্ফুটিত আঁখি,
কি মাধুরী অনুপম, আহা মরি মরি!
পরাণে জড়ায়ে বালা কাহার মুরতি
সারাটী জনম-ভরা আছ গো নেহারি?

নীরবে ফুটিয়া ধনি, গগনের কোলে
জীবনের উষা-ভাগ কর কি স্মরণ?—
গাঁথিয়া মরম-গীতি প্রীতি-মালাকারে
গোপনে হৃদয়-মাঝে করিতে বরণ!—

সারাটী জীবন ভরে করে আরাধনা,
পেলে না যারেক দেখা! হায়, অভাগিনি!
কি আশায় তবু জাগ যুগ-যুগ-ব্যাপী
আপনা-বিভলা অয়ি প্রিয়বিরহিণি?

এদেশের মত কি গো ও-দেশ কঠিন—
ঘৃণা তুচ্ছ অবহেলা হিংসা-দ্বেষে ভরা?
কঠিন সমাজ-বাঁধ সেথাও কি রাজে
অপূরণ সাধ আশা, সুখ-শান্তি-হারা!

শ্রীমতী চারুবালা দত্তগুপ্ত।

---

# সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্ম-মন্দিরম্

আমাদের অধিষ্ঠান-ভূমি এই ভূলোক কত বড়? ইহার ব্যাস প্রায় ৮,০০০ এবং পরিধি ২৫,০০০ মাইল। এই পৃথিবীতে কত সাগর, মহাসাগর, নদী, হ্রদ, পর্ব্বত, প্রান্তর, অরণ্য, এবং জীব-জন্তু ও মানবের বাসভূমি আছে! কিন্তু সমুদায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় এই পৃথিবী একটী বালুকণা। এক আমাদের সৌর জগতে এই পৃথিবীর ন্যায় কত গ্রহ উপগ্রহ সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে! কিন্তু যখন ভাবি যে, আকাশের এক একটী নক্ষত্র এক একটী প্রকাণ্ড সূর্য্য, তাহাদিগের চারিদিকে আবার কত গ্রহ উপগ্রহ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তখন কতই আশ্চর্য্য হই! কিন্তু এই আকাশটা কত বড়? ইহার আরম্ভ, শেষ ও দিগন্ত-সীমা কে নির্ণয় করিতে পারে?